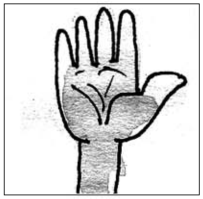

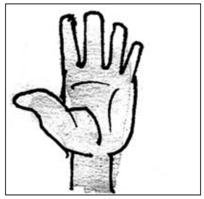

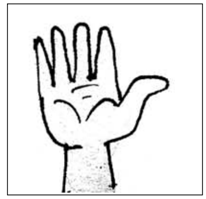

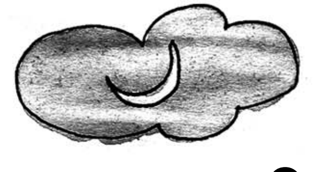

# ঈদ স্পেশাল হাসিফল

এ ঈদে কার কপালে কী আছে? কেমন যাবে এবার ঈদ? আসুন জেনে নেয়া যাক ঈদে কার ভাগ্যে কী ঘটবে, রাশিতে রাশিতে এখন সেই খবর–

**মেষ রাশি :** সেলামি ভাগ্য ভালো, সেলামি দিতে দিতে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের আনাগোনা বাড়বে, তাই বেশি বেশি সেমাই তৈরি করতে হবে। কোথাও গিয়ে সেমাই ভেবে কেঁচো গিলে ফেলতে পারেন।

**বৃষ রাশি :** নামাজ শেষে ফিরতি পথে ভিক্ষুকদের তাড়া খেয়ে বেকায়দায় পড়ে যেতে পারেন। বিপত্তি বাধবে তখন, যখন আপনি তাদের খুচরা পয়সা গছিয়ে দিতে চাইবেন। সুতরাং মান-সম্মান নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে সঙ্গে টাকার বস্তা রাখুন। প্রয়োজনে চেক ব্যবহার করুন।

**মিথুন রাশি :** ফোনে গোল্ডের কথা বললে Bussy Gold সিম নিয়ে আসবে। চাঁদ দেখতে গিয়ে ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার সম্ভাবনা এবং পুরো ঈদ পঙ্গুর বেডে কাটিয়ে দিতে হতে পারে। সুতরাং চাঁদ দেখার বাসনা চেপে রাখুন, নতুন প্রেম শুভ নয়।

**কর্কট রাশি :** নতুন প্রেম করা থেকে সাবধান। এমনকি পুরনো প্রেমিকাকেও তোয়াজ করে চলুন। মেয়েদের সঙ্গে কোলাকুলি করার ইচ্ছেটা এবারের মতো ভুলে যান। মার্কেটে গেলে জ্ঞান হারানোর সম্ভাবনা শতভাগ।

**সিংহ রাশি :** রাশিটা সিংহ হলেও এবারের ঈদে আপনাকে ইঁদুরের মতো থাকতে হবে। কারণ হাইজ্যাকার কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বোনাসের সব টাকা গায়েব হওয়া হেতু এবার বউ-বাচ্চাদের কারো বায়নাই পুরা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং বোনাসের টাকা মোটেও তুলবেন না, ঈদের দিন ছ্যাঁক খাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং ওই দিন প্রেমিক-প্রেমিকাকে এড়িয়ে চলুন।

**কন্যা রাশি :** প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পাজামায় নিয়ারের গিট্টু খুলতে না পারার কারণে ঈদের দিন পাজামা নষ্ট হতে পারে। সুতরাং পাজামার বদলে প্যান্ট পরুন। একান্ত প্রয়োজন হলে নিয়ার ছাড়া লুঙ্গি প্রসেসে পাজামা পরুন। টাংকি মারা শুভ। তবে গালে মেয়েদের কোমল হাতের সজোরে স্পর্শ লাগতে পারে।

**তুলা রাশি :** ফ্যাশন সচেতন হোন, এবার আপনি যা পরবেন পাবলিক ভাবতে পারে আপনি হেমায়েতপুর থেকে আগত। কোলাকুলির সময় সাবধান। পকেট ফাঁক হয়ে যেতে পারে।

**বৃশ্চিক রাশি :** বউ-ছেলে-মেয়েদের মাইনকা চিপায় পড়ে বনবাস নিতে হতে পারে। সুতরাং 'বনের রাজা টারজান' ছবিটি দেখে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। কেনাকাটা শুভ। তবে সেটা না করাই ভালো। দোকানদারের তেলেসমাতির কারণে পাঞ্জাবি কিনতে গিয়ে আন্ডারওয়ার নিয়ে বাড়ি ফিরতে হতে পারে।

**ধনু রাশি :** ঈদে খাবার খেয়ে পেট ফাঁপা ধরতে পারে, তাই শিগগিরই সিনেমা হলে গিয়ে একটি ছিঃনেমা দেখে বমি করলে হালকা অনুভব করবেন। এবারের দর্শক জঘন্য টিভি অনুষ্ঠান 'ওয়াক থুঁ' অনুষ্ঠানটি না দেখাই ভালো। দেখলে বমি করতে করতে হাসপাতালে যেতে হবে।

**মকর রাশি :** মিথ্যা বলা ও টালবাহানা করা থেকে সাবধান। বউ বাচ্চাদের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারেন। শেষে ভয়ানক গৃহযুদ্ধের বিভীষিকায় কেটে যাবে এবারের ঈদ। সুতরাং সত্যবাদী হোন। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে লোন করে বউ বাচ্চাদের তুষ্ট রাখুন। ঋণখেলাপির লিস্টে শীর্ষে নাম চলে এলেও দমে যাবেন না।

**কুম্ভ রাশি :** দূরের যাত্রা শুভ। সুতরাং ঈদ করতে গ্রামের বাড়ি চলুন, তবে বাসের হেলপারদের টানাটানির চোটে আপনি চট্টগ্রাম যেতে চেয়ে দিনাজপুর চলে যেতে পারেন। সুতরাং নিজের গ্রামের বাড়ির বিপরীত দিকে কোথাও আত্মীয়তা করে রাখুন। গুরুপাক খাবার থেকে সাবধান। লোভ সংবরণ করে রাখুন। ঈদ-পরবর্তী ডায়রিয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

**মীন রাশি :** ঈদে লোডশেডিং হলে ভুলেও রাস্তায় আন্দোলনে নামবেন না, এতে পুলিশের টিয়ার গ্যাস খেয়ে পুরো ঈদের দিন কেঁদে কাটাতে হবে। প্রেমিকাকে নিয়ে ঈদের দিন রিকশায় বেরুলে সাবধান? রিকশাওয়ালা ২০০ টাকা বখশিশ দাবি করতে পারে। ভুঁড়িওয়ালারা ভুলেও কোলাকুলি করবেন না। পরস্ত্রীকাতরতা শুভ।

**বিশিষ্ট জ্যোতিষী**
**এ এস এম তৌফিকুন্নবী** (মেন্টাল বাবু)
(পাবনা হেমায়েতপুর থেকে ১০ বছর ডিগ্রি লাভ প্রাপ্ত)

---

# আধুনিক টোনা-টুনির গল্প

সুমন আহমেদ

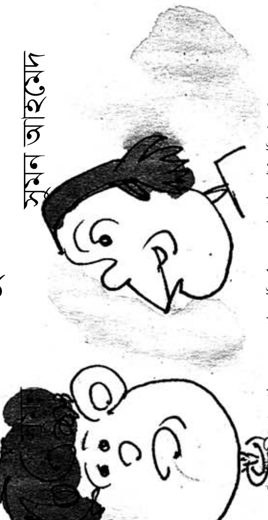

একদা এক দেশে বাস করিতো টোনা আর টুনি। তাদের মনে সুখ ছিল না। কারণ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই এদের মাঝে ঝগড়া লাগিয়া থাকিতো। এক দিন টোনার ইচ্ছা হইলো পিঠা খাইবার। সে তার ইচ্ছাটির কথা টুনিকে জানাইলে টুনি সর্পের ন্যায় ফস করিয়া উঠিয়া কহিলো চাউল, চিনি, নারিকেল বাদে পিঠা কি আমার মাথা দিয়া বানাইবো? যদি তুমি আমারে এগুলানসহ কিছু কসমেটিকস আইন্না দিবার পারো তবেই আমি তোমারে পিঠা বানাইয়া খাওয়াতে পারি। তবে মনে রাইখো, এইটাই কিন্তু ফার্স্ট এবং লাস্ট টাইম। টুনির মুখ থ্যেইকা পিঠা বানাইয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া টোনা খুশিতে আত্মহারায় তৃপ্ত হইয়া একখান ক্লোজ ডাউন মার্কা হাসি দিলো। অতপর সে পিঠার সরঞ্জামাদি কিনিতে বাজারের উদ্দেশে রওনা হইলো। কিন্তু হায় একি! বাজারের কোনো পণ্যের দামই যে স্থিতিশীল নাই। সব কিছু যে টোনার সামর্থ্য আর বাজেটের বাইরে। বাজারের প্রায় প্রতিটি পণ্যেরই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ২ থেকে ৩ গুণ। সবচেয়ে বড় কথা হইলো চিনির দাম শুনিয়া টোনা মাথা ঘুরাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলো। যাক তবুও সে সামান্য চিনি আর চাউল লইয়া পিঠা খাইবার উদ্দেশ্যে বাড়িমুখী রওনা হইলো। পথিমধ্যে টোনার সঙ্গে দেখা হইলো স্থানীয় এক এমপির।

এমপিকে কাছে পাইয়া টোনা তার নিজ চোক্ষের দেখা বাজার পণ্যের চওড়া মূল্যের কথা খুলিয়া কহিলো। কিন্তু এমপি টোনার সব কথা শুনিয়া ও তা মানিবার নহে। তিনি কিছুতেই টোনার কথা বিশ্বাস করলো না। বরং টোনার সামনে তিনি মাথা উঁচা করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেশের উন্নয়ন হইয়াছে, দেশ এখন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। দেশে কোনো সমস্যা নাই, দ্রব্যমূল্য এখন হাতের নাগালে। এমপির মুখে এ সমস্ত কথা শুনিয়া টোনা খুব ক্ষিপ্ত হইয়া গেলো। বললে ভুল হবে, শুধু টোনা-ই না, এমপির কথায় আশপাশের সমস্ত জনগণও ক্ষিপ্ত হইয়া গেলো।

এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনতা এমপিকে লক্ষ করিয়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে লাগিলো। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া এমপি মশাই খুব ভয় পাইয়া গেলেন। তখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে এমপি তার সাথে থাকা পুলিশদের ফাঁকা ফায়ারের হুকুম দেন। পরিস্থিতি শান্ত করিতে পুলিশ জনতার উদ্দেশে ফাঁকা ফায়ার টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এতে হিতে বিপরীত ঘটে পরিস্থিতি। সম্পূর্ণ রূপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এক পর্যায়ে জনতা এমপিকে ধাওয়া করিলে তিনি পলায়নের উদ্দেশে পিছন দিকে দিলেন দৌড়, টোনাও ছুটিলেন এমপি মশাইয়ের পিছন পিছন তাকে ধরার জন্য। দৌড়ের এক পর্যায়ে টোনার হাতে থাকা পিঠার সরঞ্জামাদি মাটিতে পতিত হইয়া তা সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া যায়।

অবশেষে টোনার আর পিঠা খাওয়া হইলো না। সে খালি হাতে বাড়ি ফিরিলো। তবে পিঠা খাইতে না পারিলেও টোনা যে এমপি মশাইকে একখান শিক্ষা দিতে পারিয়াছে, এ কথা মনে করিয়া সে পিঠার কথা ভুলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলো।

আর এখানেই আধুনিক টোনা-টুনির গল্পের ইতি ঘটিলো।

সংখ্যা ৯২
বুধবার, ১১ অক্টোবর ২০০৬
e-mail
therapy@dailynayadiganta.com

## সূচি পত্র


পৃষ্ঠা ৪ — **ফ্যান্টাসিতে গিয়া আমাগো আশা...**
তখন পট করে এক জায়গায় নেমে গেল এই সুন্দরী ললনা। আদৌ কি এটা গন্তব্য ছিল, নাকি ...

পৃষ্ঠা ৬ — **আলীবাবা ও চল্লিশ ঢাকনা চোর**
আবার ঠিক এই মুহূর্তে আলীবাবার টয়লেট চাপল। তাও আবার শুধু এক নাম্বার নয় দুই নাম্বার ...

পৃষ্ঠা ৭ — **পাগল বৈজ্ঞানিকের দ্বীপে সিন্দবাদ**
'বস ডাঙা দেখা যাচ্ছে' এই কথা বলে উত্তেজিত অবস্থায় নাবিক আসিফ তার বায়নোকুলারটি ...

মাঝের পৃষ্ঠা — **ক্লোজআপ তারকাদের ফ্যান্টাসি**
স্বপ্ন সত্যি হবে– আলাদিনের চেরাগ পেলে ...

পৃষ্ঠা ১১ — **স্যুটকেস কুমার**
কেউ রাজার এ খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে কোনো কথাই বলতে পারল না। রাজার লোকজন খুঁড়েই চলল, খুঁড়েই চলল...

পৃষ্ঠা ১৩ — **পুরনো Fantasy-এর নতুন রূপ**
মাঝে মাঝে একঘেয়েমি দূর করতে প্রয়োজন গল্পের ফর্ম পাল্টানোর; ঠিক সে রকমই একটা প্রয়াস নিয়ে এবারের কার্টুন ...

পৃষ্ঠা ১৪ — **নো নেমস ল্যান্ড**
আমি ওর স্মার্ট জবাবে খানিকটা অবাক হলাম। এই আমাদের মমিন আলী ওরফে কদম ...


# ঈদে বাড়ি গমনকারীদের জন্য একখান ঈদ গিফট

**শাহাদাত ফাহিম**

ঈদ গিফট যেসব সময় দম আটকানো প্যাকেটবন্দী করে জিনিসকে আধমরা করে দিতে হবে তা পাইলেন কই। ডিজিটাল যুগে ঈদ গিফট হওয়া চাই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী। এবার হতে পারে সেটা কখনো আদিমীয় দম আটকানো আবার কখনো বা আধখোলা এবং কখনো একেবারে খোলা। (তবে আবার ওই খোলামেলা বুঝবেন না যেন) যা-ই হোক অথবা যাহাই হোউক আপনার ঈদ গিফট 'ঈদে বাড়ি যাওয়ার তলিকা' বুঝে নিন।

- বইয়ের পাতায় লেখা রয়েছে আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাস বর্ষাকাল। বেশ ভালো কথা। কিন্তু এ দুই মাসে যে, এখন আর আগের মতো বৃষ্টিঝরা বর্ষার দেখা পাওয়া যায় না, তাই এখন বলা উচিত আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাস শুকনোকাল! এবং বর্ষা যেহেতু শরতে এসে মাতব্বরি ঝাড়ছে সেহেতু ঈদে বাড়ি যেতে পারেন একখান কলার ভেলায় চেপে। এতে অন্তত হালিখানেক ফায়দা রয়েছে।

১. প্রাণপাখি উড়ে যাই যাই অবস্থার জ্যাম থেকে মুক্তি সিনেমা ইয়ে সরি মুক্তি পাওয়া।
২. অগ্রিম সিট বুকিং দিয়েও সিটের নিশ্চয়তা না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়া।
৩. অতিরিক্ত ভাড়া দিয়েও বোনাট এবং মোড়া কিংবা আখের এক পিঁড়িতে বসার আজাব থেকে বাঁচা।
৪. মোটা অঙ্কের ভাড়াটা মানিব্যাগ থেকে নির্বাসন না হয়ে নিজের মানিব্যাগটাকে পেটুক বানিয়ে রাখা।

- একটা স্ক্রিন এক্সারসাইজ গেঞ্জি। এক পিস শর্ট প্যান্ট এবং দুইখান কেডসের ভেতর নিজেকে সঁপে দিন।

অতঃপর রাজপথে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে যদি পুরুষ হন তাহলে বিশ্বসেরা দৌড়বিদ মরিস গ্রিনের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করুন। অতঃপর চোখ খুলে দৌড় শুরু করুন বাড়ির দিকে। আর যদি লেডিস হন তাহলে একই কায়দায় নিজেকে তুলনা করুন মারিয়ান জোন্সের সঙ্গে অতঃপর দেন ভোঁ দৌড়।

- নিজেকে লাশ বানিয়ে ফেলতে পারেন। কী ব্যাপার লাফ দিয়ে উঠলেন যে, মউতকে বুঝি এতই ভয় পান। ঠিক আছে তাহলে আপনাকে লাশ হতে হবে না। তবে লাশ হওয়ার অভিনয়টা করতে হবে। কি পারবেন তো! যদি পারেন তাহলে চটজলদি একখান কফিনের ভেতর ঢুকে পড়ুন। এবং অ্যাম্বুলেন্স খবর দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আর যারা আপনার সঙ্গে যাবেন তারা কান্নার অভিনয় করবে চোখে গ্লিসারিন দিয়ে। ব্যস আরামসে চলে যান বাড়ি। তবে ধরা খেলে তার জন্য লেখক দায়ী নই।

- বিজ্ঞান কোনো গান নয়। আপনি যদি এ জ্ঞানটুকুর কফিল হয়ে থাকেন তাহলে বিনা ফিকিরে আপনি নিজেকে একজন বিজ্ঞানী ভাবতে পারেন। আর সেই ভাবনার লেজ ধরে বাড়ি যাওয়ার জন্য দুইখানা ডানা তৈরি করে ফেলুন। আর দুটিকে দুই পাজরে ফিট করে হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলে যান কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আই মিন বাড়িতে।

- এই পাড়ে আমি আর ওই পাড়ে তুমি, মাঝখানে নদী আর মরুভূমি। ভুলতে পারি না। তোমায় ভুলতে পারি না...। এই গানটি বারবার আউড়িয়ে বাড়িতে থাকা প্রিয়জনের জন্য নিজের মাঝে আলাদা একটা আকর্ষণ তৈরি করুন। পারেন তো প্রিয়জনের জন্য পাগলও হয়ে যেতে পারেন। অতঃপর বাড়ির দিকে রওনা দিন। দেখবেন এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করলেন বাড়িতে।


সম্পাদক **আলমগীর মহিউদ্দিন,** প্রকাশক **শামসুল হুদা** কর্তৃক ১৬৭/২-ই, ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স) মতিঝিল ঢাকা-১০০০ থেকে দৈনিক নয়া দিগন্তের সাপ্তাহিক রম্য ম্যাগাজিন হিসেবে থেরাপি প্রকাশিত।
থেরাপিতে চিঠি লেখার ঠিকানা : থেরাপি, নয়া দিগন্ত, ১৬৭/২-ই, ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স) মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৭১০২৪৪১, ৭১০২৪৪৮ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১০১৮৭৭, e-mail : therapy@dailynayadiganta.com, valo_chalay@yahoo.com



**থেরাপিতে প্রকাশিত, অপ্রকাশিত সব লেখাই কল্পনাবিলাসী মস্তিষ্কের অবদান। কারো সঙ্গে তা মিলে যেতেই পারে। গেলে তা কাকতালীয় মাত্র, না গেলে সত্যি এর জন্য থেরাপি তো নয়-ই, অন্য কেউও দায়ী নয়।**

ফ্যান্টাসির খোঁজে

# ফ্যান্টাসিতে গিয়া আমাগো আশা...

অনাবিল

### শনিবারে শনির আছর

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফ্যান্টাসি কিংডমে যাওয়ার ডেটটা শনিবারে পড়ল। থেরাপির বিভাগীয় সম্পাদক হিমেল ভাইসহ থেরাপি কার্যালয়ে জমায়েত হলাম আমরা নয় কুতুব। থেরাপির পক্ষ থেকে ফ্যান্টাসি সংখ্যার ফ্যান্টাসির খোঁজেই সেখানে যাত্রা। হঠাৎ রনক উধাও। অনেক তল্লাশির পরও যখন জনাবকে পাওয়া গেল না, তখন হিমেল ভাই বললেন, আসেন আমরা বাসস্ট্যান্ডে যাই। ওখানে গিয়ে ফোন দিলেই রনকের হদিস মিলবে। গেলাম মতিঝিল বাসস্ট্যান্ডে। মুন্না বারবার ট্রাই করতে লাগল রনককে ফোন করার জন্য। কিন্তু ব্যাটার নম্বর ননস্টপ বিজি। বিজি নম্বর যখন কোনোভাবেই ইজি করা যাচ্ছিল না, তখন রনককে রেখেই চলে যাওয়ার একটা মহৎ চিন্তা আমার মাথায় ঢুকল। কারণ, রনক মিয়ার টনক নড়ানোর জন্য এর চেয়ে উত্তম তরিকা আর নেই। কিন্তু আমি আমার প্রস্তাবখানা যেই না থেরাপির দরবারে উপস্থাপন করতে যাব, অমনি দেখি রনক হাজির। কী আর করা। ওকে নিয়েই উঠতে হলো বাসে। ভাবলাম, এতক্ষণ রনকের কারণে যা-ই হয়রান হয়েছিল, এবার বসে বসে হালকা-পাতলা ঘুমানোর মধ্য দিয়ে একটু রেস্ট নেয়া যাবে। কিন্তু বিধি বাম। বাসে উঠে সিটে বসেই মুন্না আর রনক পকেট থেকে মোবাইল বের করল। তারপর শুরু হলো গ্যাজানো– ওগো, খেয়েছ, কী দিয়ে খেয়েছ? ডিম দিয়ে? হাঁসের ডিম না মুরগির ডিম? ভাতের সঙ্গে কি লবণ খেয়েছ? আয়োডিন তো? আচ্ছা, এখন তুমি কী করছ? ঘুমোচ্ছ? কিভাবে ঘুমোচ্ছ? শুয়ে নাকি বসে? চোখ বন্ধ করে নাকি খুলে? ওফ অসহ্য! গ্যাজানোর তো একটা শেষ আছে। কিন্তু মুন্না আর রনকের গ্যাজানো শুধু রাবারের মতো লম্বা থেকে লম্বাতর হচ্ছে। তাদের গ্যাজানোর সাইজ দেখে আমি তো বটেই, এমনকি সুমন ও পৃ রীতিমতো থ। কোনো কথা নেই কারো মুখে। গুলিস্তান... 'সরি', গুলশান হাবীব রাজীব ও সৈকত আছে অন্যভাবের জগতে। কারণ একটাই, আর তাহলো তাদের সামনের সিটে পরমা সুন্দরী এক ললনা আসন গ্রহণ করেছে খানিক আগে। এ জন্যই এই দুই পাবলিকের আনন্দ আর ধরে না। বেশ আওয়াজ দিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে দুজন। উদ্দেশ্য ললনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু বরাত মন্দ। ললনা একবারের জন্যও ওদের দিকে ফিরে তাকায়নি। তারপর যখন তারা মোটামুটি বেপরোয়া হয়ে উঠল অর্থাৎ যেকোনো প্রকারে ললনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কথাবার্তার সাউন্ড বাড়িয়ে দিল, তখন পট করে এক জায়গায় নেমে গেল এই সুন্দরী ললনা। আদৌ কি এটা গন্তব্য ছিল, নাকি রাজীব আর সৈকতের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উনি নেমে গেলেন– এটা অবশ্য বিস্তর গবেষণার বিষয়। সময়-সুযোগ মতো আমরা না হয়– এক সময় গবেষণাটা করে নেব। ওকে।

### কিংডমে কিংদের প্রবেশ

ফ্যান্টাসি কিংডমের সামনে আমাদের গাড়ি যখন গিয়ে থামল,তখন বিকেল চারটা। বাস থেকে নেমেই আর কোনো কথা নেই, মুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ভাবটা এমন– হিমেল ভাই থাকতে আমাদের কোনো ভরসা... থুরি... ভয় নেই। ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হয়ে গেল হিমেল ভাইয়ের জটিল তাড়া কুইক ড্রেস চেঞ্জ করে নিন। ওয়াটার কিংডমে আশু আর লিয়াকে খুঁজতে হবে। আদেশ শিরোধার্য করে আমরা নেমে পড়লাম পানিতে। প্রথমে বিষয়টি খেয়াল না করলেও হঠাৎ যখন খেয়াল করলাম, মুন্না ও রনকের গেঞ্জি লেপ্টে থাকা শরীরের দিকে, তখন বুকের ভেতরে হু-হু-হা-হা শুরু হয়ে গেল। কেন হবে না বলুন। কারো শরীরে যদি দুর্ভিক্ষের ছাপ স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে, তাহলে...

পানিতে লাফালাফি, দাপাদাপির কয়েক পর্ব শেষ হলে শুরু হলো নৃত্য পর্ব। অর্থাৎ মিউজিকের তালে তালে নাচা। প্রথমবার কী যেন একটা অপরিচিত গান বাজানো হলো। তাই নাচ খুব একটা জমলো না। কিন্তু যেই না 'একবার আযা আযা' গানটা ছাড়া হলো, অমনি শুরু হয়ে গেল সাম্বা-নৃত্য। আর এই নৃত্যের মূল নৃত্যশিল্পী হলো রাজীব। নাচ কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী– তা সবাইকে সে বুঝিয়ে দিল মিনিট তিনেকের মধ্যেই। তার সঙ্গে সঙ্গে সৈকতও কিন্তু কম নাচেনি।

## ফিরে পাওয়া এক স্বপ্নরাজ্য

রণক ইকরাম

স্বপ্নের মতো মজার এক রাজ্যের রাজা ছিল ছোট্ট বালক আশু। আশু রাজার ছিল তারই মতো ছোট এক রানী লিয়া। সেই রাজ্যটা ছিল স্বপ্নপুরীর মতো। সেখানকার সবাই কেবল খেলা করত। আশু রাজা আর লিয়া রানী তাদের চার বন্ধু সিপার, জুজু, ব্যাঙাসোর আর বোবোকে নিয়ে প্রতিদিন মেতে উঠত খেলায়। কিন্তু এক দিন একচোখা দানব ও তার কুচক্রী বন্ধুদের প্রভাবে রাজ্যের শান্তি নষ্ট হয়। দানব লিয়া রানীকে বন্দী করল আর ধূলিঝড়ে আশু রাজা আর তার বন্ধু উড়ে গিয়ে পড়ল সাত সমুদ্র তের নদী দূরে। এরপর এক অভিযানের মাধ্যমে দরবেশের পালকের সাহায্যে তার স্বপ্নরাজ্য উদ্ধার করল। ফিরে পাওয়া এ স্বপ্ন রাজ্যের আদলেই তৈরি আজকের ফ্যান্টাসি কিংডম। আশু আর লিয়ার সেই পুরনো গল্পের ফ্যান্টাসির সন্ধানে আমরা পাড়ি জমাই ফ্যান্টাসি কিংডমে। সেখানকার একেকটা রাইড আর আশু ও লিয়ার প্রতিকৃতি বারবার আপনাকে নস্টালজিক করবে। রাইডগুলোতে চড়তে গেলে মনে হবে আপনি বুঝি আশু রাজার রাজ্য উদ্ধার অভিযানে নেমেছেন। থেরাপি বাহিনীর ফ্যান্টাসি কিংডম যাত্রায় বিশেষ সহযোগিতা করেন ফ্যান্টাসি কিংডমের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (মার্কেটিং) জনাব মাহফুজুর রহমান।

আমাদের যে যাত্রা, সেটা নিয়ে লিখতে গেলে শুরুতেই আমার নিজের জন্য নিন্দা প্রস্তাব এবং জনাব শরীফ বিল্লাহ, এজি মাহমুদ ও জনাবা শিখার জন্য শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা জরুরি। আমার জন্য নিন্দা প্রস্তাব এই কারণে যে, আমার কারণে থেরাপি বাহিনীর ফ্যান্টাসি কিংডম যাত্রা কিঞ্চিৎ(!) বিলম্বিত হয়েছে। শিখা থাকলে বাহিনীতে গ্ল্যামারের অভাবটা এত তীব্রভাবে অনুভূত হতো না। আর শরীফ বিল্লাহ তো দেশের বাড়িতে গিয়ে বিয়েসংক্রান্ত জটিলতায় (বাতাসে ভেসে বেড়ানোর কথা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দায়ভার নিজের ওপর বর্তাবে) মোবাইল ফোনটি পর্যন্ত বন্ধ রেখেছিল। তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করাই হয়ে ওঠেনি। আর মহামান্য এজি সাহেব জাবিতে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ওহ, বলে রাখা ভালো এই মুহূর্তে আমরা একটা 'ফ্যান্টাসি' সংখ্যা না করে 'হরতাল' সংখ্যা করতে পারলেই মনে হয় ভালো হতো। কারণ ফ্যান্টাসি কিংডমে যাওয়ার জন্য আমরা পরপর দুই বৃহস্পতিবার ডেট করি। বিরোধী দলের অশেষ কৃপায় দুবারই হরতাল পালিত হয়েছে। শেষমেশ শনির দশার ভয় না করে শনিবারকেই 'ফ্যান্টাসি ডে' হিসেবে বেছে নিলাম।

তবে যদ্দুর মনে হয়, সৈকতের নাচে কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কারণ ওর নাচে জায়গাটা নিশ্চিত ইঞ্চি দুয়েক তলিয়ে গেছে। বাব্বা! হবে না, সৈকতের যা ওজন! তবে কত কেজি, তা ঠিকমতো বলা যাচ্ছে না। কারণ সৈকত এ পর্যন্ত তার ওজন মাপাতে পারেনি। শুনেছি, সে ওজন মাপার কথা বললেই নাকি মেশিনওয়ালারা তার হাতে-পায়ে ধরে মাফ চেয়ে বলে– বাজান, আপনে মেশিনে উঠলে মেশিন ভাইঙ্গা চুরমার অইয়া যাইব গা। পৃ ও সুমনকে আমরা খুব করে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সঙ্গে গোছল করতে, নাচতে। কিন্তু ব্যক্তিদ্বয় আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করে অলটাইম দেখার কাজে নিয়োজিত রেখেছিল নিজেদেরকে। না, না; আমাদেরকে দেখার কাজে নয়, জুটি দেখার কাজে। চিপায়-চাপায় বসে থাকা, এখানে-ওখানে নাচতে থাকা, খিলখিলিয়ে হাসতে থাকা আরো কত্তো জুটি। ওদের রোমান্টিকতা দেখে পৃ আর সুমন তো বটেই, আমাদের গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

**ক্ষুধার রাজ্যে ফ্যান্টাসি কিংডম গদ্যময়**

দুপুরে তো বটেই, এমনকি সকালেও পেট ভরে খাইনি। কারণ একটাই। আর তাহলো, বিকেলে ফ্যান্টাসি কিংডমে গিয়ে খাব। বাসা থেকে খেয়ে গেলে যদি পেট বুকিং হয়ে যায় আর যদি আচ্ছামতো গলাধঃকরণ করতে না পারি– এই দুশ্চিন্তায় সকাল থেকেই ডায়েট কন্ট্রোল আর কি। কিংডমের সব কার্যক্রম যখন শেষ হলো তখন আর কারো মুখের দিকে তাকানোর জো নেই। রণক আর মুন্নার পেট তো একেবারে পিঠের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এমনিতেই যা বডি এই দুই পাবলিকের। বলা যায়, একালের রবিউল। রাজীব, সৈকত, সুমন, পৃ, বাবু ভাই ও হিমেল ভাইয়ের কন্ডিশনও খুব একটা সুবিধার নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ক্ষুধার ঠেলায় সবার পেটে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু না হলেও প্রস্তুতি চলছে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আমাদের ডাক পড়ল খাবারের জন্য। আমাদের আনন্দ দেখে কে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার ওপর অন্ধকার। অতএব আমাদের আনন্দ দেখার কেউ ছিল না। বড়ই আফসোসের ব্যাপার-স্যাপার।

দেখার কেউ না থাকলে আনন্দ করা যাবে না, এমন বিধান যেহেতু দেশে প্রচলিত নেই, অতএব আমরা ব্যাপক আনন্দ করতে করতে ক্যান্টিনে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু আমাদের খাবার-দাবারের এন্তেজাম যিনি করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সেই রাম ভাই ম্যালা আগেই প্রস্থান করেছেন। তার প্রস্থানে আমাদের মনে দ্বিমুখী দুর্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। প্রথম দুর্ভাবনাটা হলো, আমাদেরকে পেট ভরে খাওয়ানো হবে তো! আর দ্বিতীয় দুর্ভাবনাটা হলো, পেট ভরে খাওয়ালে আবার বিলটিল চেয়ে বসবে না তো! আমরা বসে আছি তীর্থের কাউয়ার মতো। মাগার খাবার-দাবারের কোনো হদিস নেই। সামনে দু-চার পিস খালি প্লেট ছিল। সবাই সেগুলোতে ফাউ ফাউ হাত বুলাতে লাগলাম। ততক্ষণে পেটের ভেতর থেকে পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। ইচ্ছা করছে খাবারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যাটাদেরকে মেরে তক্তাজাতীয় একটা কিছু বানিয়ে ফেলি। কিন্তু এর জন্য যে এনার্জি দরকার, তা তো থাকতে হবে। একেক জনের চোখ-মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ক্ষুধায়। হাত-পায়েও ক্ষুধাজনিত কারণে হালকা-পাতলা কাঁপন ধরে গেছে। অতএব ব্যাটাদেরকে মেরে তক্তা বানানোর সদিচ্ছা মন থেকে সরিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম খাবারের জন্য। অবশেষে এল। খাবার নয়, পানি। ভেবেছিলাম, মিষ্টি পানিটানি হবে। কিন্তু মুখে দেয়ার পরই বুঝলাম, একেবারে টলটলে পানি। হিমেল ভাই ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন– পানি খাইয়েই বিদায় দেয় কি না, কে জানে। তার কথা শুনে অন্তরাত্মা তড়াক করে উঠল। সত্যি সত্যিই যদি পানি খাইয়ে বিদায় দেয়! দুশ্চিন্তায় সবার অবস্থা যখন কেরোসিন কিংবা ডিজেল, ঠিক তখনই খাবার নিয়ে হাজির হলো দুজন।

খাওয়া শেষে উঠব যে, পেছন থেকে অবার ডাক দিয়ে বসবে না তো বিলের জন্য– এই মিয়ারা বিল না দিয়া যান কই? ফ্যান্টাসি কিংডম কর্তৃপক্ষের কল্যাণে আমাদেরকে ফ্রি খাওয়ানো হয়েছে। নাকি বিলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি পালন করা হয়েছে– কোনোভাবেই নিশ্চিত হতে পারছিলাম না আমরা। আরে ধুর! বিল চাইলে চাইবে, হিমেল ভাই আছে না! তাকে রেখে আমরা সবাই দৌড় লাগাব। বিল যা রাখার উনার কাছ থেকে রাখবে। আমরা দৌড়ে এসে একেবারে বাসে উঠে বসে পড়ব। আমাদেরকে ধরতে পারলে তো! ভয়ে ভয়ে বেরোতে লাগলাম ক্যান্টিন থেকে। কান খাড়া করে রেখেছি, কখন পেছন থেকে বিলের জন্য ডাক দেবে, আর কখন আমরা হিমেল ভাইকে রেখে জান হাতে নিয়ে দৌড় লাগাব। কিন্তু না, দৌড় লাগানোর দরকার হয়নি। কারণ কর্তৃপক্ষ আমাদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করিয়েছিল। আমাদের পাশাপাশি আপনারাও ইচ্ছা করলে আনন্দিত হতে পারেন। এ জন্য আপনাদেরকে বিশেষ কোনো চার্জ দিতে হবে না।

**বৃষ্টির বিটলামি এবং...**

পেটে ক্ষুধার পরিমাণ যত ডিগ্রিই হোক না কেন, বাসায় তো ফিরতে হবে। অতএব বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম। এদিকে একটানা বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। নো বিরতি, নো থামাথামি। ভিজে যখন মোটামুটি নাই হয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল একটু দূরে এক বেঞ্চিতে বসে থাকা এক ডিসকো লেডির ওপর। মুহূর্তে ফুরফুরে হয়ে গেল মনটা। জিন্সের প্যান্ট পরা, গায়ে লাল ফতোয়ার মতো কী যেন একটা, আর মাথা ও মুখের বেশ কিছু অংশ ঢাকা ওড়না বা এজাতীয় কিছু একটা দিয়ে। রাতের অন্ধকারের কারণে তেমন বোঝা যাচ্ছে না। তবে মেয়েটি যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। আমি জামা-কাপড়, মাথার চুল ঠিকঠাক করতে লাগলাম। ভাবের পরিমাণটাও বাড়িয়ে দিলাম কয়েক গুণ। আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছি মেয়েটার দিকে। বাহ! বেশ লম্বা চুল তো মেয়েটার। আজকাল সাধারণত এত লম্বা চুল রাখে না মেয়েরা। মাথার আবরণের ফাঁক দিয়েই বোঝা যাচ্ছে, ম্যালা লম্বা চুল। আমি তাকিয়ে আছি, আর ভাবের পরিমাণ বাড়িয়েই যাচ্ছি। হঠাৎ হাতের ইশারায় আমাকে ডাক দিল মেয়েটি। আমি যেন বিদ্যুতের শক খেলাম। সত্যিই আমাকে ডাকছে তো? চোখ রগড়িয়ে নিলাম কয়েকবার। আবারও হাতের ইশারায় ডাক দিল মেয়েটি। নাহ, এবার আর কোনো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ থাকবে কেন? মেয়েটি নিশ্চিত চিনে ফেলেছে আমি থেরাপির লেখক। নিশ্চিত অটোগ্রাফের জন্য ও ডাকছে আমাকে। অটোগ্রাফ দেয়ার সময় কী লিখব– এটা ভাবতে ভাবতে ব্যাপক ভাবের সহিত এগিয়ে গেলাম মেয়েটির কাছে। মেয়েটির মাথা এবং মুখমণ্ডল তখনো কাপড় দিয়ে বাঁধা। আমি তার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে যেই না তার দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালাম, অমনি দেখি খোঁচা খোঁচা গোঁফ। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভরাট কণ্ঠ– ভাইজান, আপনার কাছে কি দিয়াশলাই হবে? অনেকক্ষণ ধরে সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়েছে।

মনটা ছ্যাড়াব্যাড়া হয়ে গেল। ওদিকে বাস এসে দাঁড়িয়েছে স্ট্যান্ডে। অতিশয় বেদনাময় মন নিয়ে উঠে বসলাম সিটে। ওফ্...

ও, এমন ফ্যান্টাসি আয়োজনের জন্য ফ্যান্টাসি কিংডমের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে কিন্তু ভুল করিনি আমরা কেউই।

# ওয়াটার ওয়েভ

## গুলশান হাবিব রাজীব

থেরাপির আমরা ছাড়াও অনেকে এসেছে এই ওয়াটার কিংডমে। তিন-চারটা রাইডে চড়ে বেশ মজা করলাম সবাই। তারপর ঘোষণা শুনলাম, ওয়াটার ওয়েভ চালু করা হবে। এটা রেডিওর ওয়েভ বা মাইক্রো ওয়েভ নয়। এটি পানির কৃত্রিম স্রোত। যারা সমুদ্রে বা নদীতে স্রোত দেখে মজাপান কিন্তু ভয়ে স্রোতে নামতে পারেন না, তাদের আনন্দের জন্য এই ওয়াটার ওয়েভ।

ওয়েভের নির্ধারিত স্থানে পাঁচজন পাঁচটি টিউব নিয়ে পানিতে নেমে পড়লাম। আর অন্যরা টিউব না পেয়ে টিউব ছাড়াই পানিতে নেমে পড়ল। আমি, বিভাগীয় সম্পাদক হিমেল ভাই, সৈকত, রনক ও মুন্না টিউবের ওপর ভাসছি। একবার সামনে যাচ্ছি আবার পেছনে। অপেক্ষা করছি ওয়াটার ওয়েভের জন্য। ছেলেমেয়েসহ প্রায় ৩০ জন পানিতে। হঠাৎ করে দু পাশ থেকে ফোয়ারার মতো পানি আসতে লাগল। সামনে থেকে শুরু হলো কৃত্রিম স্রোত। সবাই আনন্দে মেতে উঠল। তখন মনে হলো, আমরা সত্যি সমুদ্র বা নদীর ঢেউয়ের মধ্যে ভাসছি। অন্যরকম এক অনুভূতি। ওয়েভের নির্ধারিত স্থান থেকে ঢেউ আসছে। কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এই ঢেউ, সেটা আমাদের অজানা থেকে গেল। যেভাবে ঢেউ সৃষ্টি হোক না কেন বেশ উপভোগ করছিল সবাই। কয়েকজন ছেলেমেয়ে পানির মধ্যে লাফাতে লাগল। অনেকে গোল হয়ে ঘুরছে। আমরা টিউবের ওপর ভাসছি। সেই সময় আমার ও মুন্নার টিউবের ওপর ভাসছি। সেই সময় আমার ও মুন্নার টিউব উল্টে গেল ঢেউয়ের জন্য। নাক-মুখ দিয়ে কিছু পানি প্রবেশ করল। দাঁড়িয়ে টিউব ধরলাম। এবার টিউবের মধ্যে শরীর ঢুকিয়ে হেঁটে ঢেউয়ের উৎপত্তি স্থলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। বি.স মানে হিমেল ভাই তখন বললেন, উৎপত্তিস্থলের কাছে নিয়ে যেতে পারলে পুরস্কার আছে। কী পুরস্কার গোপন রাখছি। আমার মনে হয়, সেদিক যাওয়ার কারণ– সেদিকে কয়েকজন ললনা বেশ মজা করছিল। এ কথায় নিশ্চয়ই বস রেগে যাবেন।

ইকবার খন্দকার তার শক্তিশালী দেহ নিয়ে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিল টিউব ছাড়াই। এসব দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল সুমন আহমেদ ও মোকাদ্দিম। রনক তার হালকা শরীর নিয়ে ঢেউয়ের দিকে যেতে বেশ বেগ পেয়েছিল। সে বেশ কয়েকবার টিউব নিয়ে উল্টে গিয়েছিল।

এই ওয়াটার ওয়েভ কী যে মজার, তা নিজে না এলে বুঝতে পারতাম না। প্রায় ১০ মিনিট ধরে চলল এই ঢেউ। কখনো বড় ঢেউ, কখনো ছোট ঢেউ। মজা করার সময় মনে ভয় ছিল না ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সমুদ্রের ঢেউ অনেককে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু এই ওয়াটার ওয়েভে এই ভয় ছিল না। আপনারা যারা এই ওয়াটার ওয়েভে এসেছেন, তারা এর মজা বুঝেছেন আর যারা আসেননি তারা এলে বুঝতে পারবেন। ওয়েভ থেমে গেলে সবাই পানি থেকে উঠে এলাম। তখন পাশে ছাড়া হলো কৃত্রিম ঝরনার পানি। চলল মিউজিক। তারপর নাচ, যে যার মতো...।

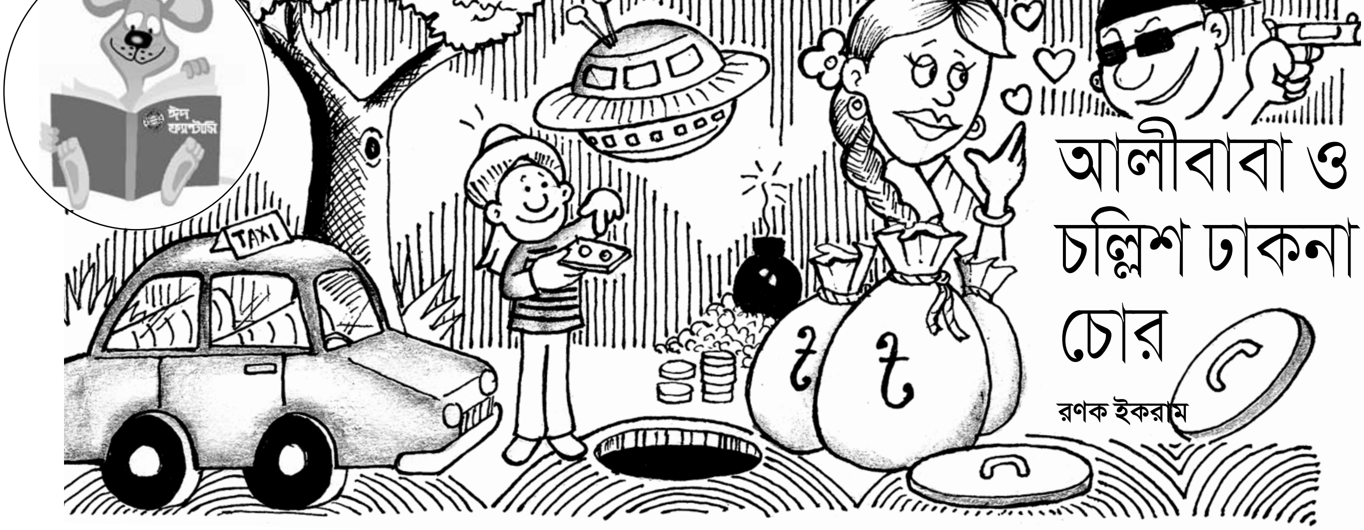

# আলীবাবা ও চল্লিশ ঢাকনা চোর

**রণক ইকরাম**

ঘ্যাঁচ করে সিএনজি ক্যাবটা থেমে যাওয়ায় ভয় পেয়ে গেল আলীবাবা। যা ভেবেছে তাই– গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। এ রকম একটা নির্জন-ব্যাকওয়ার্ড জায়গায় এসে ক্যাবের গ্যাস ফুরিয়ে যাবে কিছুতেই ভাবেনি আলীবাবা। আসলে সকালবেলা বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বের হওয়াতে আজ মেজাজটাই বিগড়ানো ছিল। তাই লং জার্নির আগে বেশি করে গ্যাস নিতে ভুলে গিয়েছিল। একে তো গ্যাস সমস্যা আবার ঠিক এই মুহূর্তে আলীবাবার টয়লেট চাপল। তাও আবার শুধু এক নাম্বার নয় দুই নাম্বার। উপায় না দেখে একটা গাছের আড়ালে সিএনজিটাকে ঠেলে পার্ক করল। এরপর চিপার খোঁজে পা বাড়াল আলীবাবা। উদ্দেশ্য আর কিছুই না, স্রেফ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া। একটা পাথুরে দেয়াল ঘেঁষে দুই টিলার মাঝামাঝি একটা জুঁতসই জায়গা দেখে বসে পড়ল আলীবাবা। কর্ম আধাআধি সারবার পরই বিকট শব্দে চমকে উঠল আলীবাবা। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা উড়ন্ত সসার এদিকেই আসছে। আলীবাবা কী করবে না করবে সেটা ভাবার আগেই তার খুব কাছে ল্যান্ড করল সসারটা। ততক্ষণে আলীবাবা ত্যাগকর্ম সম্পাদন করলেও সেখান থেকে না সরে আরেকটু আড়ালে গিয়ে ঘটনা কী ঘটে তা দেখতে লাগল। সসারটা থামতেই ওটার ভেতর থেকে কতগুলো ষণ্ডামার্কা লোক বেরিয়ে এল। নেমেই এরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল। আলীবাবা গুনে দেখল সংখ্যায় ওরা ৪০ জন। আলীবাবা ঘটনার আগামাথা কিছুই বুঝল না তবু চাতক পাখির মতো চেয়ে রইল। ওই লোকগুলোর পোশাক-আশাক একই রঙের মতো না হলেও সবার মাথাতেই হিমেল রেশামিয়ার মতো একই রঙের ক্যাপ আছে। আর সবার হাতেই একই মডেলের মোবাইল সেট শোভা পাচ্ছে। ১৫-২০ জনের কোমরে পিস্তলের হোলস্টারে পিস্তল দেখে আলীবাবা বুঝতে পারল লোকগুলো ভালো নয়। সবাই গোল হয়ে দাঁড়ানোর পরই কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। একজন বলল–

: বস্, কাজ শুরু করে দেব নাকি।

: হু, তা তো করতেই হবে।

বসের কথা শেষ না হতেই আরেকজন বলে উঠল–

: আচ্ছা, এক বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ কিসের?

একেবারে মানুষের ইয়ের মতো?

ষণ্ডাটার কথা শুনেই আলীবাবার বুকটা ধক্ করে উঠল। কারণ এই মহান কর্মটা যে তারই করা!

: আরে কোথায় দুর্গন্ধ? কিছুই না। জলদি কাজ শুরু কর।

আরেকটা ষণ্ডা ব্যাপারটাতে পাত্তা দিল না বলে এ যাত্রায় বেঁচে গেল আলীবাবা। এরপর ওদের বস একজনকে লক খোলার নির্দেশ দিল। আলীবাবা লক্ষ করল একজন লোক একটু কোণার দিকে এগিয়ে গেল। সেদিকে গিয়ে লোকটা একটা বড় পাথর সরাল। পাথরের নিচ থেকে একটা চাবি বের করল। এবার ওই চাবিটা দিয়ে ওইখান থেকে হাত তিনেক দূরে একটা ঢাকনা খুলল লোকটি। আলীবাবা বুঝল ওটা একটা বাক্স। সেই বাক্স থেকে লোকটি কী যেন একটা বের করল। একটু পরেই জিনিসটাকে চিনতে পারল আলীবাবা।

ওটা আসলে একটা রিমোট কন্ট্রোলার। রিমোট কন্ট্রোল হাতে লোকটা এগিয়ে গিয়ে সেই পাথুরে দেয়ালের পাশে একটা টিলার সামনে দাঁড়াল। এরপর বলল–

: বস কোডটা যেন কত?

: ফোর টুয়েন্টি ফোর টুয়েন্টি।

আলীবাবাও মনে মনে উচ্চারণ করল কথাটা। এর মধ্যেই আলীবাবা অবাক হয়ে লক্ষ করল সেই টিলাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। ভেতরে কিছুটা অন্ধকার। অন্যদিকে বাকি লোকগুলো সসার থেকে গোল গোল কী যেন নামাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরই জিনিসগুলো চিনতে পারল আলীবাবা। ওগুলো সব ম্যানহোলের ঢাকনা। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে পৃথিবীতে হঠাৎ করেই লোহার ঘাটতি দেখা দেয়ায় লোহার দাম এখন সোনার মতো অনেক বেড়ে গেছে। এ কারণেই লোহা নিয়ে চারদিকে এত বেশি টানাটানি। কিন্তু এতসংখ্যক ম্যানহোলের ঢাকনা লোকগুলোর কাছে কিভাবে এল? আলীবাবা বুঝল এরা নিশ্চয়ই ঢাকনা চোর। এদের নিয়েই ভাবছিল আলীবাবা। হঠাৎ মশার কামড় খেয়ে আলীবাবা নড়ে উঠল। আর নড়ার ফলে তার বাঁ পায়ে ময়লা লেগে গেল। দারুণ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েও এতটুকু নড়ল না আলীবাবা। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে ওরা সসার থেকে ঢাকনা নামাল। এরপর ওরা সেই গুহার ভেতর কিছুক্ষণ সময় কাটাল। গুহা থেকে বেরিয়ে সবাই সসারে উঠে গেল। কেবল একজন লোক রিমোটটা দিয়ে দরজা বন্ধ করে সেটাকে বাক্সের মধ্যে রেখে তালা দিল। আর চাবিটাকে পাথর চাপা দিয়ে সেও সসারে উঠে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই আকাশে উড়তে লাগল সসার। আলীবাবাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। প্রথমেই সে তার ময়লা লাগা পা-টাকে ওয়াশ করল। তারপর দুরু দুরু বুক নিয়ে পাথরচাপা চাবিটা বের করল। সেই লোকটার মতো করে চাবিটা দিয়ে পাশের বাক্সটা খুলে রিমোটটা বের করল আলীবাবা। এরপর সেই টিলারূপী গুহামুখের সামনে এগিয়ে গেল আলীবাবা। সিএনজির ড্রাইভার হলেও আলীবাবা ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। তাই রিমোটটা হাতে নিয়ে সাহস করে ফোর টুয়েন্টি ফোর টুয়েন্টি বোতাম চেপে 'ইয়েস' বাটন চাপল আলীবাবা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল সেই রহস্যময় টিলার দরজা। ভেতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল আলীবাবা। প্রচুর ম্যানহোলের ঢাকনা আর সোনাদানা থরে থরে সাজানো। পাশেই একটা কাঠের খোলা আলমারীর মতো তাকে প্রচুর টাকার বান্ডিল সাজানো।

আলীবাবা যতগুলো সম্ভব ততগুলো টাকা তার গাড়িতে উঠাল। বেশ ক'টা ঢাকনাও সে গাড়িতে তুলে নিল। কিন্তু গ্যাস ছাড়া গাড়ি চলবে কী করে? চিন্তায় পড়ে গেল আলীবাবা তখনি হঠাৎ গুহার কোণায় রাখা একটা কনটেইনারের দিকে চোখ পড়ল আলীবাবার। প্রায় দৌড়ে গিয়ে কনটেইনারের ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকে আলীবাবা বুঝল এটা পেট্রল। আলীবাবার সিএনজি ডুয়েল লাইন করা। গ্যাসেও চলে তেলেও চলে। তেল ঢেলে স্টার্ট দিতেই দেখল সব ওকে আছে।

এরপর আলীবাবা আবার গুহায় ঢুকে কনটেইনারটা জায়গামতো রেখে বাইরে এসে ফোর টুয়েন্টি ফোর টুয়েন্টি চেপে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রথমে রিমোটটাকে বাক্সবন্দী করার পর চাবিটাকে পাথরচাপা দিয়ে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরল আলীবাবা। সে দিনই দ্বিতীয়বারের মতো সেখানে গিয়ে ইচ্ছামতো গাড়ি ভরে টাকা-পয়সা আর ধনসম্পদ নিয়ে এল আলীবাবা।

এ ঘটনার পর রাতারাতি বদলে গেল সিএনজি ড্রাইভার আলীবাবার অবস্থা। সিএনজি ছেড়ে আলীবাবা এখন লিমুজিন হাঁকায়। পাড়া-প্রতিবেশীর পাশাপাশি ব্যাপারটা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরও নজর এড়াল না। ফলে র‍্যাবের এক সোর্সকে রহস্যের কূলকিনারা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হলো। সেই সোর্সের আবার প্রেম ছিল আলীবাবার সুন্দরী কন্যা মর্জিনার সঙ্গে। ফলে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। র‍্যাবের সোর্স কুদ্দুস প্রেমিকা মর্জিনাকে তার মিশনের ব্যাপারটা বলে ফেলল। এরপর মর্জিনার বাপ আলীবাবাও কুদ্দুস আলীকে পুরো ঘটনা খুলে বলল। সব শোনার পর কুদ্দুস জানাল এরা হচ্ছে ৪০ চোরের একটা গ্যাং। লোহার দাম বেড়ে যাওয়ার পর থেকে এরা ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করছে আর সবখান থেকে লোহা লুট করছে। দীর্ঘদিন থেকে পুলিশ এদেরকে খুঁজছে। কিন্তু আলীবাবা এদের খোঁজ পাওয়ার পরও পুলিশকে না জানিয়ে অন্যায় করে ফেলেছে। শেষে মর্জিনা কেঁদে-কেটে কুদ্দুসকে এ বিষয়টার একটা বিহিত করার অনুরোধ করল। কুদ্দুস তার বড় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টা আলাপ করল। কর্তৃপক্ষ আলীবাবাকে সাহায্য করবে তখনোই যখন আলীবাবা কর্তৃপক্ষকে ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ক্ষমা পাওয়ার আশায় আলীবাবা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। আলীবাবা র‍্যাবের বিশাল বাহিনী নিয়ে ওই স্থানে উপস্থিত হলো।

এরপর আগের মতো করে সেই রহস্যময় দরজা খুলে দিল। প্রথমেই র‍্যাব তাদের হেলিকপ্টার দিয়ে গুহার টাকা-পয়সা, ম্যানহোলের ঢাকনাসহ সবকিছু সরিয়ে ফেলল। তারপর এই আস্তানার বিভিন্ন কোনায় সাতটি শক্তিশালী বোমা সেট করে রেখে র‍্যাবের একটি ইউনিটকে চোরদের অপেক্ষায় রাখা হলো। নির্দেশ দেয়া হলো যখনই চোরেরা গুহায় প্রবেশ করবে তখনই রিমোর্ট চেপে গুহাটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। এক দিন-দুই দিন কেটে গেল কিন্তু চোরেরা আর আসে না। কুদ্দুসের নেতৃত্বাধীন র‍্যাবের ইউনিট অপেক্ষ করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়ল। তৃতীয় দিন বেলা ১টার দিক একটা সসার এসে থামল গুহার সামনের দিকের সমতল জায়গায়। নড়েচড়ে উঠল র‍্যাবের ইউনিট। সবাই কানে তুলা গুঁজে নিল।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। ধীরে ধীরে ওরা সবাই সসার থেকে নামল। এদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে রিমোট বের করে দরজা খুলল। এদিকে কুদ্দুস বাহিনীও রিমোট হাতে রেডি। গুহার দরজা খুলতেই একজন ভেতরে ঢুকে চিৎকার করে ওঠল। সম্ভবত গুহা খালি দেখে। সে বাইরে এসে ব্যাপারটা সবাইকে জানাতেই সবাই একযোগে গুহার দিকে ছুটল। শেষ চোরটা গুহার ভেতর প্রবেশ করতেই কুদ্দুস বাহিনী বোম ফাটাল। ব্যস ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল গুহাটি। আর মানুষগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আলীবাবার মেয়ে মর্জিনার সঙ্গে কুদ্দুসের বিয়ে হয়ে গেল। যৌতুক হিসেবে আলীবাবা কুদ্দুসকে মূল্যবান ১০টি ম্যানহোলের ঢাকনা প্রদান করে। অতঃপর তাহারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে লাগল...।

# পাগল বৈজ্ঞানিকের দ্বীপে সিন্দবাদ

এ জি মাহমুদ

**এক.**
বিশাল সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে সিন্দবাদের বাণিজ্যিক ইয়ট। গম্ভীর মুখে সিন্দবাদ জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। সিন্দবাদের ইয়টটাকে বাইরে থেকে দেখতে টাইটানিক জাহাজের মতো ফিটফাট মনে হলেও ভেতরে ভেতরে ঢাকা শহরের সদরঘাটের মতো অবস্থা। ইয়টটা এখনো পালের ধাক্কায় নড়াচড়া করে। চার-চারবার বাণিজ্য যাত্রায় গ্যাঞ্জাম পাকিয়ে এখন টাকা-পয়সার অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। পয়সার অভাবে ইয়টটাতে একটা মোটর ইঞ্জিনের ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে না। ব্যাকডেটেড পালের ইয়ট নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিশেষ সুবিধা করা যাচ্ছে না। তাই সিন্দবাদের মুড বিশেষ ভালো নেই। এর মধ্যে হঠাৎ করে হু... হা...হা...হা করতে করতে শূন্যে এক জিনব্যাটার আমদানি ঘটতে শুরু করলে সিন্দবাদের মন-মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যায়। বলা নেই, কওয়া নেই কোত্থেকে যেন মাঝে মধ্যেই এসব যন্ত্রণা এসে ঝামেলা পাকায়। সিন্দবাদ মোড়েল চোখে জিনটার দিকে তাকিয়ে দেখে তার বয়স না টিনএজার টাইপের একটা জিন। দাড়ি রেখেছে ইমরান হাশমির মতো। সিন্দবাদ একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলল এই কী চাও? এখন ফুটবল কেনার জন্য কোনো চাঁদাটাদা দিতে পারব না। টাকা-পয়সার অবস্থা বড়ই খারাপ। জিনটা মাথা নেড়ে বলল, আসলে আমি কোনো চাঁদা চাইতে আসিনি, আমি এসেছি একটা ইনফরমেশন নিয়ে যেটা আপনার খুবই দরকার। সিন্দবাদ চোখ সরু করে বলল, 'কিসের ইনফরমেশন?' জিনটা এবার বলতে শুরু করল, আমি যতদূর জানি আপনার ইয়টের জন্য মোটর ইঞ্জিন দরকার কিন্তু টাকা-পয়সার সমস্যা বলে লাগাতে পারছেন না। কিন্তু আমার কাছে একটা দ্বীপের খবর আছে যেখানে গেলে ওই দ্বীপে বসবাসরত প্রায় আধপাগল এক বুড়ো বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে মুফতে মোটর ইঞ্জিন ম্যানেজ করা যেতে পারে। সিন্দবাদ বলল, 'ওকে আমি তোমার ইনফরমেশন কিনব বাট কত চাও?' মোটামুটি দামাদামি করে জিন্দাবাদ ইনফরমেশনের সিডিটা জিনের কাছ থেকে ২০০ ইউনিট খরচ করে কিনে ফেলল। ল্যাপটপে দ্বীপটার অবস্থান নির্ণয় করে সিন্দবাদ সারেংকে দ্বীপের দিকে ইয়টাকে ঘোরোতে বলে রেলিংয়ে ভর দিয়ে একটা স্যান্ডউইচে কামড় বসাল। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে স্যান্ডউইচ নয়, সিন্দবাদ পাগলা বৈজ্ঞানিকের দ্বীপটাই কামড়ে খাচ্ছে।

**দুই.**
'বস ডাঙা দেখা যাচ্ছে' এই কথা বলে উত্তেজিত অবস্থায় নাবিক আসিফ তার বায়নোকুলারটি সিন্দবাদের দিকে বাড়িয়ে দিলে সিন্দবাদ সেটা চোখে দিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু একই বায়নোকুলার দিয়ে আসিফ ডাঙা দেখতে পেলেও সিন্দবাদ কেন যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সেই রহস্য নিয়ে মিনিট তিনেক মাথা ঘামানোর পর সিন্দবাদ বুঝতে পারল প্রতিবারই সে বায়নোকুলারটা উল্টো করে ধরেছিল তাই এই দুরবস্থা। যা-ই হোক সিন্দবাদ নৌকা নিয়ে সবার আগে দ্বীপে গিয়ে নামতেই কোত্থেকে যেন একঝাঁক জংলি উ লু লু করতে করতে তেড়ে এল। সিন্দবাদ বুদ্ধি করে তার হাতে ধরা সাদা পতাকাবাহী ডাণ্ডিটাকে এদিক-ওদিক করার চেষ্টা করে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, আমি বন্ধু। কিন্তু তাতেও জংলিদের দৌড় থামল না দেখে সিন্দবাদ বুঝতে পারল এখানে ধান্দা খারাপ। জংলিরা ধরতে পারলে দো-পেঁয়াজা করে খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলার আগে থামবে না। তাই ব্যাগ থেকে একটা স্মোক বম্ব বের করে জংলিদের দিকে ছুড়ে মেরে সিন্দবাদ পালিয়ে চলে এল। টানা দু দিন সিন্দবাদ খেয়ে না খেয়ে দ্বীপের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে চলে এল। এই দু দিন ঘোরাঘুরি করে সিন্দবাদ ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। কারণ সে এখনো পাগলা বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরির দেখা পায়নি। চার দিনের দিন জঙ্গলের ভেতরে একটা প্রায় ভাঙাচোরা বিশাল বাড়ি দেখতে পেল। কিন্তু সমস্যা হলো বাড়িটা ভাঙাচোরা হলেও বাড়ির গেটে বিশাল তালা। এমন সময় নামল বৃষ্টি। আশপাশে অনেক ডেকেও সিন্দবাদ কাউকে না পেয়ে তার বিখ্যাত সুলেমানি তরবারি বের করে সেটা দিয়ে এক কোপে তালাব্যাটাকে ধরাশায়ী করে দিল। গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই কোত্থেকে কী একটা ছুটে এসে সিন্দবাদের মাথায় লাগতেই সিন্দবাদ মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল।

**তিন.**
জ্ঞান ফিরতেই সিন্দবাদ দেখল সে যেখানে পড়ে ছিল ঠিক সেখানেই আছে। কেউ তাকে ধরে নিয়ে যায়নি। সিন্দবাদ মাথার পেছনটা ডলতে ডলতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে এদিক-সেদিক ঘুরতেই একটা রুমে পাগলা বৈজ্ঞানিককে খুঁজে পেল। বুড়ো পাগলাটা একটা হুইল চেয়ারে বসে আছে। সিন্দবাদ কাছে যেতেই বুড়োটা জিজ্ঞেস করল 'তুই কে?' সিন্দবাদ 'তুই' সম্বোধন শুনে খানিকটা ঘাবড়ে গেল। এত বড় বৈজ্ঞানিক কি সহজে একজন অপরিচিত মানুষকে তুই বলতে পারে। নিশ্চয়ই এ বুড়ো ভণ্ড। বৈজ্ঞানিককে বেঁধে রেখে তার হুইল চেয়ারে বসে আছে। সিন্দবাদ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি সিন্দবাদ; আপনি কে? বুড়া শয়তানি হাসি হেসে বলল, 'আমি স্টিফেন রকিং, বিজ্ঞান চর্চা করি। তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো? সিন্দবাদ মোটর ইঞ্জিন মাগনা পাওয়ার ধান্দায় বুড়োকে খুশি করার জন্য বলল, 'কী সাহায্য?' বৈজ্ঞানিক বলল, না তেমন কিছু না, আমার হুইল চেয়ার খানিকটা ডিস্ট্রার্ব দিচ্ছে, তুমি কি আমাকে একটু চেয়ারটা থেকে সরিয়ে নেবে। এই চেয়ার থেকে অন্যের সাহায্য ছাড়া ওঠা যায় না। সিন্দবাদ ভাবল এটা তো কোনো ব্যাপারই না। সে বুড়োকে চেয়ার থেকে ওঠানোর পর বুড়ো চট করে দাঁড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে সিন্দবাদকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। এই ঘটনায় সিন্দবাদ প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও বুড়োর হাসি দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। ধাক্কা সামলিয়ে চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলে সিন্দবাদ তা পারে না। বুড়ো বৈজ্ঞানিক চিৎকার করে বলে, 'হা: হা: হা: আমি এতদিন তোমার মতোই একজনকে খুঁজছিলাম। যাকে এই চেয়ারে বসিয়ে আমি মুক্ত হয়ে যেতে পারব। বহু বছর আগে তোমার মতো ভুল আমিও করেছিলাম। সিন্দবাদ জবাবে কী বলবে ভেবে পায় না। মোটর ইঞ্জিন মুফতে জোগাড় করতে এসে যে এমন মাইনক্যার চেয়ারে আটকে যেতে হবে কে জানত?

**চার.**
এক মাস পর সিন্দবাদ সিওর হয়ে যায় এই পাগলাটে বুড়ো তাকে কখনো কোথাও যেতে দেবে না। কথায় কথায় সিন্দবাদ জানতে পারে এই বুড়ো কী এক ওষুধ আবিষ্কার করেছে যা মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারলে মানুষ দ্রুত বুড়ো হয়ে যায়। মানুষ চেষ্টা করে ওষুধ আবিষ্কারের যেটা ব্যবহার করলে মানুষ তরুণ হতে পারে আর এই পাগলা বুড়ো নিজেও বুড়ো আর ধান্দা করছে কিভাবে আরো দ্রুত বুড়ো হওয়া যায় সেই ব্যাপারে। এই বুড়ো বানানোর ওষুধ নাকি সিন্দবাদের শরীরে পুশ করে দেখা হবে। শুনে তো সিন্দবাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। এই পাগল বুইড়া দুনিয়ার সবাইকে বুড়ো বানিয়ে ফেলতে চায়। কী সর্বনাশ! সিন্দবাদ কথায় কথায় জানতে পেরেছে বুড়োর কাছে মোটর ইঞ্জিন আছে। কিন্তু আর লাভ কী? সিন্দবাদ তো বুড়ো হয়ে এই দ্বীপেরই নতুন খুঁড়ো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সিন্দবাদ একটা বুদ্ধি খুঁজে পায়। সিন্দবাদকে বৈজ্ঞানিক যেখানে আটকে রেখেছে সেখানে কতগুলো রোবট আছে। বেশিরভাগই নষ্ট তবে মেরামত করা যেতে পারে। সিন্দবাদ খেয়াল করে, একটা রোবটের ব্যাটারির কম্পার্টমেন্ট খালি। কিন্তু দূর থেকে রোবটটাকে ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভালো ব্যাটারি সিন্দবাদ কোথায় পাবে? অথচ যা করার আজকেই করতে হবে কারণ আজ দুপুরের দিকে পাগলটা ওষুধ পুশ করে সিন্দবাদকে থুড়থুড়ে বুড়ো বানিয়ে দেবে। হঠাৎ করে সিন্দবাদের মনে পড়ে ও যে হুইল চেয়ারটাতে বসে আছে সেটাতেই ব্যাটারি আছে কিন্তু ইলেকট্রনিক চেয়ারটায় মোটর নষ্ট বলে সেটা খুব বেশিদূর যেতে পারে না।
দুরুদুরু বুকে সিন্দবাদ চেয়ার থেকে ব্যাটারি খুলে রোবটের ব্যাটারির কেসে লাগিয়ে দিতেই রোবটটার চোখ পিটপিট করে জ্বলে ওঠে। এ সময় দরজায় দেখা যায় পাগলা বৈজ্ঞানিককে। স্টিফেন রকিং কিছু বুঝে ওঠার আগে রোবটটা দড়াম করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সিন্দবাদ তৎক্ষণাৎ আদেশ করে আমাকে চেয়ার থেকে উঠাও। রোবটটা টান দিয়ে চেয়ার থেকে মুক্ত করে সিন্দবাদকে। সিন্দবাদ দ্রুত ঘরের এক পাশে পড়ে থাকা তার সুলেমানি তরবারিটা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে বুড়োর পিঠে দড়াম করে বাড়ি মেরে বসে। বুড়ো শিরদাড়ায় আঘাত পেয়ে দড়াম করে বসে পড়ে চেয়ারে। সিন্দবাদ চট করে সিরিঞ্জটা স্টিফেন রকিংয়ের গায়ে পুশ করে বুড়োকে বেহুঁশ করে দেয়। তারপর টান দিয়ে রোবটটার ব্যাটারি খুলে ছুড়ে ফেলে দেয় পাশের নর্দমায়। রোবটটা কাত হয়ে পড়ে যায় বুড়োর কোলে মাথা রেখে। সিন্দবাদ আর দেরি না করে দুটো মোটর ইঞ্জিন ল্যাবরেটরির ছাদে রাখা হেলিকপ্টারে উঠিয়ে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে কপ্টারটাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে আসে। আকাশে উড়ে সিন্দবাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভাবে– যাক শেষ পর্যন্ত মুফতেই দুটো মোটর ইঞ্জিন পাওয়া গেল। এখন ঠিকভাবে ইয়টে ফিরতে পারলেই হয়।

# খরগোশ ও কচ্ছপ

গুলশান হাবিব রাজিব

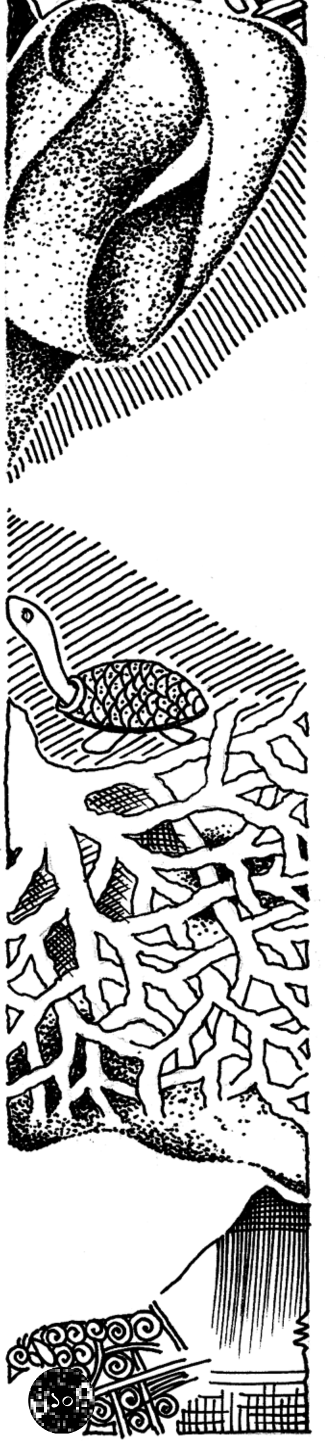

বিংশ শতাব্দীর খরগোশ ও কচ্ছপ এক সময় মিটিং করল। তারা তাদের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক করতে শুরু করল। খরগোশ দাবি করল, তার যোগ্যতা বেশি। সে সব দিক দিয়ে এগিয়ে। যেকোনো কাজ সে করতে পারবে। অন্যদিকে কচ্ছপও দাবি করল, তার যোগ্যতা বেশি। তাদের তর্ক চলতে থাকল। কেউ কাউকে ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। তারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথমে তারা সিদ্ধান্ত নিল, হরতালে পিকেটিং করবে এবং গাড়ি ভাঙবে। যে বেশি পিকেটিং করবে আর বেশি গাড়ি ভাঙতে পারবে সে হবে জয়ী।

তাই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা হরতালের সময় একসঙ্গে মিলিত হলো। আর বেছে নিল ঢাকা শহরকে। তারা শুনেছে, ঢাকাকেন্দ্রিক হরতাল বেশি। এখানে বেশি আন্দোলন হয়। নেতাকর্মী বেশি থাকে। এক সময় বিরোধী দলের ডাকে হরতাল শুরু হলো। খরগোশ ও কচ্ছপ নেমে পড়ল তাদের কাজে। খরগোশ ও কচ্ছপ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। তারা লক্ষ করল, রাস্তায় দুই-একটা গাড়ি চলছে। তখন তারা ঢিল ছুড়তে লাগল। কে কার থেকে বেশি ঢিল ছুড়তে পারবে তার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গাড়িতে কেউ ঢিল লাগাতে পারল না। তারা পড়ে গেল পুলিশের চোখে। পুলিশ এই ঢিল ছোড়া দেখে তাদের ধাওয়া করতে আর গ্যাস ছুড়তে লাগল। ফলে তারা চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল। জীবন বাঁচাতে তারা দুজনই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। পুলিশ তাদেরকে আর খুঁজে পেল না। এক ঘণ্টা পর তাদের জ্ঞান ফিরল। পুলিশের দৌড়ানি দেখে দুজনই সিদ্ধান্ত নিল, অন্য কোনো প্রতিযোগিতা করবে। তখন তারা ঠিক করল, দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। যে দৌড়ে আগে যাবে, সে হবে জয়ী। তারা দৌড় শুরু করল। খরগোশ প্রথমে এগিয়ে গেল। কচ্ছপ আস্তে আস্তে দৌড় শুরু করল। পথে যাওয়ার সময় পরল এফডিসি। এফডিসির গেটে দাঁড়িয়ে খরগোশ দেখল, ভেতরে শুটিং চলছে। নায়ক-নায়িকারা অভিনয় করছে। গানের সঙ্গে নাচছে। এসব দেখার সঙ্গে সঙ্গে খরগোশ লক্ষ করছে, কচ্ছপ আসছে কি না? যদি কচ্ছপ আসতে থাকে, তাহলে সে দৌড় শুরু করবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল কিন্তু কচ্ছপ আসছে না। তাই খরগোশ বিরক্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে আবার শুটিং দেখতে লাগল। এবং সেই সময় কচ্ছপ এফডিসি পার হচ্ছিল। সে খরগোশকে দেখতে পেল। চুপে চুপে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। খরগোশ টের পেল না। একটু দূরে অন্য এক ছবি শুটিং চলছিল। খরগোশ ভাবল, কচ্ছপ আস্তে আস্তে আসবে, আরো অনেক দেরি আছে। এই সুযোগে ভেতরে গিয়ে নাচ-গান দেখলে মন্দ হয় না। তাই খরগোশ ভেতরে গেল শুটিং দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখল, নায়ক ও নায়িকা গানের দৃশ্যের শুটিং করছে। ওপর থেকে পানি দেয়া হচ্ছে। বেশ মজা পেল খরগোশ। বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু তা সম্ভব নয়। শুধু নায়ক-নায়িকারাই ভিজবে। মন খারাপ করল খরগোশ। কিছু দূরে চলছিল অন্য আরো একটি ছবির শুটিং। সেখানেও গেল খরগোশ। একজন নায়ক একাই মারছে ডজনখানেক ভিলেনকে। খরগোশ মনে মনে ভাবল, যদি এই ডজনখানেক ভিলেন একসঙ্গে নায়ককে মারে, তাহলে নায়কের কী অবস্থা হবে। ভাগ্যিস ভিলেনরা এক এক করে নায়কের কাছে যাচ্ছে। একজনকে মারা শেষ হলে অপরজন এগিয়ে যাচ্ছে। আর বাকিরা দাঁড়িয়ে দেখছে। বাহ! চমৎকার দৃশ্য। এসব দেখতে দেখতে খরগোশ ভুলে গিয়েছিল যে, সে প্রতিযোগিতায় আছে। ঘুরতে ঘুরতে আরেকটা শুটিং স্পটে এসে পড়ল খরগোশ। সেখানে কয়েকজন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের মতো হাফপ্যান্ট পরে নাচছে। মাটিতে মৃদু কম্পন অনুভব করল খরগোশ। মাঝে এক মোটামুটি শরীরের একজন নায়ক আছে। এক পর্যায়ে মধ্যমণি মেয়েটিকে সেই নায়ক কোলে তুলতে গেল। তখনই ঘটল বিপত্তি। যেই না তুলতে গেল, ঠিক তখনই নায়িকাসহ নায়ক ধপাস। চিৎকার দিয়ে উঠল ছেলেটি। পাশ থেকে একজন বলল, কাট। নায়ককে ধরে কয়েকজন একটা রুমের ভেতর নিয়ে গেল। মনে হয় হাড় ভেঙেছে। সবাই দেখতে গেল নায়ককে। তখন দৌড় প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়ে গেল খরগোশের। সে দৌড় শুরু করল। এফডিসির গেট দিয়ে বের হয়ে ছুটল গন্তব্যের দিকে। অনেক জোরে দৌড় দিল খরগোশ। হাঁপিয়ে উঠল সে। কারওয়ান বাজারে ভয়াবহ যানজটে ও রাস্তার ভিড়ের জন্য যেতে সমস্যা হচ্ছিল। তারপরও দৌড়ে যাচ্ছে খরগোশ। গন্তব্যে পৌঁছে দেখে, কচ্ছপ সেখানে বসে আছে। খরগোশ বলল, শুটিং দেখছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম প্রতিযোগিতার কথা। না হলে আমিই আগে পৌঁছতাম। কচ্ছপ তখন বলল, আগে পৌঁছাতে বা না পৌঁছাতে সেটা বিষয় নয়, এখন আমি আগে এসেছি। তাই আমি জয়ী। খরগোশ বলল, তুমিই জয়ী। তুমি সময়মতো তোমার কাজ করেছ। আর আমি আমার কাজ ভুলে গিয়েছিলাম, সময়মতো কাজ করিনি। তাই আমার এই অবস্থা। তারপর দুজন একসঙ্গে ফিরে এল তাদের আবাস স্থানে। এরপর থেকে খরগোশ কোনো কিছুতে অহঙ্কার করত না। সব কাজ করত সময়মতো। যা করত কচ্ছপের সঙ্গে পরামর্শ করে করত। দুজন এখন বেশ ভালো বন্ধু। একে অপরের কাজে সহযোগিতা করে। কেউ বিপদে পড়লে অন্যজন এগিয়ে আসে। দুজনে একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়। বেশ মজা করে। কিন্তু হরতালের দিন বা অবরোধের দিন ভুলেও পুলিশের সামনে আসে না!

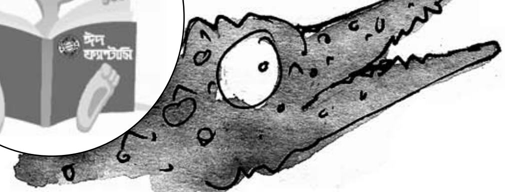

# স্যুটকেস কুমার

আহমেদ রিয়াজ

এক ছিলেন রাজা, আর এক ছিলেন রানী। রানী এক দিন স্বপ্নে দেখলেন দেশের কোনো এক জায়গায় অনেক ধন-সম্পত্তি লুকোনো আছে। শেষ রাতে দেখা স্বপ্ন, সত্যি হলেও হতে পারে। রানী তার স্বপ্নের কথা জানালেন রাজাকে। ব্যস, রাজা আর দেরি করলেন না। তিনি জমি খনন করা শুরু করিয়ে দিলেন। মাইলের পর মাইল জমি খনন করতে লাগল রাজার লোকজন। কিন্তু কোনো লুকোনো সম্পত্তি পাওয়া গেল না। রাজার এ খনন কাজে কিন্তু দেশের মানুষ মহাবিরক্ত। ফসলি জমি, আবাস ভিটে– এসব যদি মাইলের পর মাইল খোঁড়া হয়, তাহলে তো তারা বিরক্ত হবেই। কিন্তু রাজার নির্দেশ বলে কথা। কেউ রাজার এ খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে কোনো কথাই বলতে পারল না। এভাবেই চলতে লাগল দিনের পর দিন। রাজার লোকজন খুঁড়েই চলল, খুঁড়েই চলল...।

ভাগ্য ভালো খুঁড়তে খুঁড়তে দেশটা খোঁড়া হওয়ার আগেই বর্ষা চলে এল। পানিতে ভরে গেল খোঁড়া জায়গাগুলো। ক'দিন বাদে ওই টলটলে পানিতে সাঁতার কাটতে লাগল নানান জাতের মাছ। ঘোরাঘুরির জন্য বিশাল জায়গা পেল মাছরা। অল্প ক'দিনেই মাছে মাছে ভরে গেল। মহাবিরক্ত দেশের মানুষ খুব খুশি হলো। তারা অবাক হলো– রাজা কেমন করে বুঝলেন এ খোঁড়াখুঁড়িতে এত লাভ হবে! এখানেই শেষ নয়। শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। বিঘার পর বিঘা জমি ফেটে চৌচির হয়ে থাকে। সেই জমিতেও চাষ করা সম্ভব হলো। খাবারের অভাব দূর হলো অনেক। দেশের মানুষ খুশি হলো। কিন্তু খুশি হতে পারলেন না রানী। আর রানী খুশি না হলে রাজা খুশি হবেন কেমন করে? রানীর খুশিই তো রাজার খুশি। রাজা তো চেষ্টা করেছেন। যতটুকু সম্ভব খোঁড়াখুঁড়ি করেছেন, সম্ভব হলে পুরো দেশটাই খুঁড়ে ফেলতেন। সুযোগ পেলে আরো খুঁড়বেন। কারণ যেভাবেই হোক রানীর স্বপ্ন পূরণ হওয়া চাই। বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ, হেমন্ত গিয়ে শীত চলে এল। রাজা আবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতে চান। দেশের মানুষও এখন আর খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে বিরক্ত নন। রাজা তার প্রধান উজিরকে বললেন, আবার শুরু করা যায়, কী বলেন উজির সাহেব।

উজির সাহেবের নাম হয়ে গেছে মিস্টার জি। কারণ তিনি রাজার কোনো কথায় না বলতে পারেন না। সব কথাতেই জি জি করেন।

প্রধান উজির মিস্টার জি বললেন, জি।

রাজা বললেন, কিন্তু কোনো লাভ তো হচ্ছে না।

প্রধান উজির বললেন, জি।

রাজা বললেন, কখনো লাভ হবে বলে মনে করেন? কোনো দিন পাওয়া যাবে কিছু?

প্রধান উজির বললেন, জি।

হঠাৎ খবর এল আর খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে না। খবরটা দিলেন রাজার সেনাপতি। রাজা জানতে চাইলেন, কেন যাবে না? আমার প্রজারা তো মহাখুশি। টেলিভিশনে তাদের হাসি হাসি মুখ দেখলাম। রেডিওতে ওদের সাক্ষাৎকার শুনলাম। সবাই তো খুব খুশি।

সেনাপতি জানালেন, এত দিন সবাই খুশিই ছিল। ঝামেলা পাকিয়েছে হুজুর কুমির। ওই খোঁড়া জায়গা দিয়ে শয়ে শয়ে কুমির ঢুকে পড়েছে দেশের ভেতর। কুমিররা হালের গরু সাবাড় করছে। এমনকি সুযোগ পেলে প্রজাদেরও সাবাড় দিচ্ছে। তারা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছে। কেউ আর খোঁড়াখুঁড়ি চায় না।

এবার দমে গেলেন রাজা। এমনটা হবে তিনি ভাবেননি। তাহলে রানী কি ভুল স্বপ্ন দেখেছেন? রাজা এবার এক জ্যোতিষীর কাছে গেলেন। নিজের আস্তানায় রাজাকে দেখে তো জ্যোতিষী মহাখুশি। যতটা সম্ভব ধীরে সুস্থে রানীর স্বপ্ন গণনা করতে লাগলেন জ্যোতিষী। গণনা শেষ করে বললেন, রানী ঠিকই স্বপ্নে দেখেছেন মহারাজ। অমুক জায়গার তমুক খানে একটি ভাঙা স্যুটকেস আছে। ছেঁড়া ফতুয়া পরে সেই স্যুটকেস নিয়ে আসতে হবে। ওই স্যুটকেসের মধ্যেই আছে সাত রাজার ধন–অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদের পরিমাণ কত সেটা বাংলাদেশে ব্যাংকও হিসেব করে বের করতে পারবে না। যদিও দুনিয়ার বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদরা এক দিন ঠিকই সেটা বের করতে পারবে। অনেক অনেক সম্পদ মহারাজ। সুইস ব্যাংকের অনেকখানি জায়গা দখল করতে পারবে সেই সম্পত্তি। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

পারলে তক্ষুনি সেই ভাঙা স্যুটকেসের খোঁজে বের হন রাজা। সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে থামিয়ে দিলেন জ্যোতিষী, কিন্তু আমার গণনা আরেকটি কথা বলে মহারাজ।

রাজা বললেন, কী কথা।

জানতে চাইলেন জ্যোতিষী, সভয়ে বলব নাকি নির্ভয়ে বলব মহারাজ?

রাজা বললেন, সভয়েই বলুন। দেশের মানুষ রাজাকে ভয় না পেলে কি চলে? তাহলে আর সেনাপতি আছে কেন? সেনাপতির সেনারা আছে কেন? ওদের পেছনে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। রাজাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যই তো ওদের পোষা হচ্ছে। কাজেই যা বলার সভয়ে বলুন।

এবার কাঁপতে কাঁপতে জ্যোতিষী বললেন, তাহলে হুজুর সবটুকু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল একটুকুই বলবো সেই ভাঙা স্যুটকেসের হদিস পাবেন আমাদের বড় রাজকুমার। ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

দিন যায় রাত যায়। রানী অপেক্ষা করেন, কবে তার স্বপ্ন পূরণ হবে। কবে বড় রাজকুমার অভিযানে নামতে পারবেন? দেখতে দেখতে পার হয়ে যায় অনেক বছর। বড় রাজকুমারও অভিযানে যাওয়ার মতো উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। রানী এক দিন সব খুলে বলেন তাকে। বড় রাজকুমার রওনা দেন সেই ভাঙা স্যুটকেসের খোঁজে। এবং জ্যোতিষীর কথা সত্য প্রমাণ করে দিয়ে মাত্র অল্প ক'দিনেই তিনি খোঁজ পেয়ে যান স্যুটকেসটার। আর স্যুটকেসটা খুলতেই অবাক হলেন বড় রাজকুমার। কত কিছুই না বেরুলো সেই স্যুটকেস থেকে। বিশাল বিশাল জাহাজ, বিশাল বিশাল কারখানা, নানান আকারের দৈত্যদানো। আলাউদ্দিনের চেরাগের ভেতরে তো ছিল মাত্র একটা দৈত্য। ওই স্যুটকেসের ভেতরে ছিল হাজার হাজার দৈত্য। স্যুটকেস থেকে বেরিয়েই বড় রাজকুমারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল সবাই। জানতে চাইল, হুকুম করুন মালিক।

বড় রাজকুমার হুকুম করলেন। তবে কানে কানে। পাছে দেশের মানুষ কিছু শুনে ফেলে। বড় রাজকুমারের হুকুম পেয়েই নানান জায়গায় ছুটে গেল তারা। এখানেই শেষ নয়, স্যুটকেস থেকে বেরুতে লাগল বান্ডিল বান্ডিল টাকা। কত টাকা সে হিসাব নেই। কে রাখে সে হিসাব। স্যুটকেস খুললেই টাকা বেরোচ্ছে। যখনই টাকার দরকার তখনই স্যুটকেস খুলছেন রাজকুমার। আর জাদুময় সে স্যুটকেস থেকে বেরিয়ে আসছে বান্ডিলে বান্ডিলে টাকা। টাকার পাহাড়ের নিচে চাপা পড়লেন বড় রাজকুমার। ধন্য ধন্য পড়ে গেল সারাদেশে। রাজকুমার হলে এমনই হওয়া উচিত। কেবল দুঃখ একটাই–রাজা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলেন না সেই স্যুটকেসের জাদু।

আর স্যুটকেসের কারণে বড় রাজকুমার হয়ে গেলেন স্যুটকেসকুমার। দিন-রাত কখনোই স্যুটকেসটা হাতছাড়া করেন না স্যুটকেসকুমার। কেবল ভাঙা স্যুটকেস অভিযানে ব্যবহার করা ছেঁড়া ফতুয়াটা অবহেলায় রেখে দিয়েছিলেন পুরনো কাপড় চোপড়ের সঙ্গে। সেটা যে কোথায় আছে জানেন না। খবরও নেই তার। মাঝে মাঝে বিদেশী মেহমানরা আসেন। তারাও দেখেন বড় রাজকুমার ভাঙা একটা স্যুটকেস নিয়ে ঘুরছেন। তারা অবাক হন। অবাক হয়ে অনেক কিছু জানতে চান। কিন্তু রাজকুমারের নিষেধ আছে। স্যুটকেসের মাহাত্ম্য যাতে আর কেউ না জানে। যদিও দেশের প্রায় সব মানুষ স্যুটকেসের জাদুর কথা জানে। জানে আরো এক রাজকুমার। কে জানে সেই রাজকুমারেরও এমন একটি জাদুর স্যুটকেসের আকাঙ্ক্ষা আছে কি না? জানতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছু দিন। যদি আকাঙ্ক্ষা থেকেই থাকে তাহলে কেমন করে সেই স্যুটকেসের হদিস পাবেন এবং সেই স্যুটকেস কী কী জাদু দেখাতে পারে সেটাও জানা যাবে। সে জন্যও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। স্বপ্ন দেখার পর অনেক অনেক দিন যেমন অপেক্ষা করেছিলেন রানী। ■

# এই সময়ের আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ ও অপ্রাপ্তি...

শরীফ বিল্লাহ

আলাদিনের হাবভাব ইদানীং খুব একটা ভালো ঠেকছে না। ঠেকবেই বা কেমন করে। বাপ-মা হারা এতিম সন্তানের পক্ষে এর চেয়ে ভালো থাকা খুব একটা শোভা পায় না। যদি শোভাই পেত, তাহলে ২৩-২৪ বছর বয়সেই চাচীর ঘরে লালিত হয়ে সে আজ পথে পথে ঘুরত না। আলাদিনের বয়স যখন পাঁচ বছর নয় মাস ছুঁই ছুঁই, ঠিক তখনই তার বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়স্থল বাবা মারা যায়। বাবার মৃত্যুর বছরখানেক আগেই তার মা মারা গেছে। আর সেই থেকে সবার নানা লাঞ্ছনা-বঞ্চনার মধ্য দিয়েই তার দিন-রাত পার হচ্ছে। জীবনের ভাগ্য পরিবর্তনে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাগজ টোকাই করে বিক্রি করে। আজ পর্যন্ত ২০-২৫ টাকার বেশি সে কখনোই বিক্রি করতে পারেনি। তবে তার মনে একটা পরিকল্পনা আছে আর তা হচ্ছে সে যদি কোনোভাবে একটি পিস্তল জোগাড় করতে পারে, তাহলে সন্ত্রাসী কায়দা-কানুনের মাধ্যমে নিজেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করবে।

(২)

আলাদিনের মনটা আজ খুবই বিষণ্ন, কারণ সকাল থেকে এ পর্যন্ত সে টোকাই করে আধ বস্তা কাগজও জোগাড় করতে পারেনি। পেটেও তেমন একটা দানাপানি নেই। পেট শুধু চোঁ...চোঁ করছে। পথচলাও বেশ ভারি হয়ে আসছে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে সে একটা ময়লার স্তূপের পাশে বসে পড়ল। শরীরটাকে এলিয়ে দিল সে। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে যেই না উঠতে যাবে অমনি পায়ের সঙ্গে লেগে কি যেন ঝনঝন করে উঠল। আলাদিন কিঞ্চিৎ ভয় পেলেও নিজেকে নিজে সে ভয় পাওয়ার অনুমতি দিল না। যদি অনুমতি দিত তাহলে সে নিজেই প্যান্টের তীব্র ক্ষতি সাধন করত। হাতে নিয়ে দেখতে পেল একটা চেরাগ। ঝুলিতে ভরে সে নিজের বস্তিতে চলে এল।

(৩)

রাত ৩টা ২৫ মিনিট। আলাদিন ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল। পায়ের সঙ্গে লেগে চেরাগটাও ছিটকে পড়ল। ঘুম থেকে লাফিয়ে না ওঠাটাই তার জন্য ব্যতিক্রমী ছিল। কারণ বস্তিতে যে হারে মশার কামড় তাতে করে লাফিয়ে সে যে আসমানে উঠে হারিয়ে যায়নি, তা-ই ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। বাম হাত দিয়ে পা চুলকাতে চুলকাতে যেই না সে ডেঙ্গু মশার উপকার-অপকারের কথা ভাবতে লাগল ঠিক তখনোই কোণার মেঝেতে ছিটকে পড়া চেরাগের দিকে চোখপড়ল। চেরাগ থেকে আস্তে আসতে ধোঁয়া বের হচ্ছে। 'চেরাগ থেকে কেন ধোঁয়া বের হয়'– এ নিয়ে যখনই একটা বিস্তর গবেষণা করতে যাবে, ঠিক সে মুহূর্তে হুর হুর করে চেরাগ থেকে একটা দৈত্য বের হয়ে এল। এ রকম একটা ঘটনা ঘটবে যদি সে আগে থেকে বুঝত তাহলে পা দুটো বগলে নিয়ে আস্ত একটা ভোঁ দৌড়ে লাগাত। কিন্তু দৈত্যটি তাকে সে সুযোগ না দিয়েই চেরাগ থেকে বেরিয়ে এল। একটি ব্যাপার আলাদিন ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছে না যে, এত বড় একটা দৈত্য কিভাবে এই ছোট্ট চেরাগে থেকেছিল তাও আবার জীবিত অবস্থায়, চেহারাটাও কেমন অদ্ভুত ধরনের, দাঁত, চোখ, নক খুবই বড় আকৃতির। দাঁত-চোখ না হয় কাটতে পারেনি কিন্তু তাই বলে নকগুলোও কাটতে পারেনি? ব্যাটা দৈত্যের কাছে কি ব্লেডের অভাব ছিল নাকি? ভয়ে আলাদিনের পা দুটি তীব্র কাঁপাকাঁপি আরাম্ভ করল, দূর থেকে যে কেউ বুঝতে পারবে বস্তিতে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেছে।

হঠাৎ আলাদিনকে উদ্দেশ্য করে দৈত্যটি বলে উঠল "মালিক (!) আমি এই চেরাগের দৈত্য। আমাকে ভয় পাবেন না। সেই ১৯৫৩ সাল থেকে আমি এই চেরাগে আটকা পড়ে আছি। দেশদ্রোহী এক লোভী শয়তান মীরজাফর আমাকে এই চেরাগে আটকে রেখে গেছে। আপনি আমাকে মুক্ত করলেন। আমি স্বাধীন। আজ থেকে আপনি-ই আমার মালিক। তাই আমি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাই। যেকোনো তিনটি ইচ্ছা আমি আপনার পূরণ করব।' আলাদিন চিন্তা করতে লাগল 'ইচ্ছা যদি পূরণ হয় তাহলে আমার আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। তাই আমি আজ এই দৈত্যের কাছে আমার জীবনের শেষ তিনটি ইচ্ছে পূরণ করতে চাইব।' দৈত্যটি আবার বলে ওঠল, 'মালিক আমি বিনিময় প্রথার বিশ্বাসী। দেনা-পাওনা যদি ঠিক থাকে তাহলে পৃথিবীর যেকোনো কাজে সুখ পাওয়া যায়। তাই আমি আপনার তিনটি ইচ্ছা তখনই পূরণ করব, যখন আপনি আমার তিনটি শর্ত পূরণ করবেন। এবার বলুন আপনার ইচ্ছাগুলো। আলাদিন বলল, 'আমি চাই প্রথমত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হতে; দ্বিতীয়ত– একটি পিস্তল, তৃতীয়ত– ধানমন্ডিতে ৫০০ তলাবিশিষ্ট একটি লাক্সারিয়াস বাড়ি।' দৈত্যটি বলল, 'ঠিক আছে মালিক আমি আপনার তিনটি ইচ্ছাই পূরণ করব কিন্তু তার আগে আমার তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া চাই। শর্তগুলো হলো– (ক) আপনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন যদি প্রতিদিন সত্য কথা বলেন, (খ) পিস্তল পাবেন যদি কারও কাছে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ না করেন (গ) ধানমন্ডিতে ৫০০ তলার ফ্ল্যাট পাবেন যদি কারো আমানত খেয়ানত না করেন। কিন্তু মালিক এর জন্য আমি আপনাকে ২০ লাখ টাকা দেব এবং পরীক্ষার পর আপনি আমার টাকাগুলো ফেরত দেবেন। আর এ পরীক্ষার সময়সীমা থাকবে মাত্র ২০ দিন।

এত টাকা আলাউদিন এর আগে আর কোনো দিন দেখেনি। সবগুলো টাকা দেখে তার মাথা ঘুরে গেল। দৈত্যের দেয়া শর্ত ভুলে সে এই টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় করবে তারও একটি খতিয়ান তৈরি করল। সে ভাবতে লাগল এই টাকা হলেই অনেক দিন সুখে-শান্তিতে দুনিয়াতে বাস করা যাবে, আর তাই সে লোভে পড়ে এই টাকা মেরে দেয়ার একটা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটা ছোটখাটো নীলনকশাও অঙ্কন করল।

(৪)

আজ আলাদিনের শর্ত পূরণের ২০ দিন পূর্ণ হতে চলল। এ ২০ দিন সে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি। ঘুম যে তার জন্য হারাম হয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও সে নিজের লোভ থেকে সরে আসতে পারেনি। দৈত্যের সঙ্গে দেয়া ওয়াদা সে সম্পূর্ণই ভুলে গেল। অবশ্য ভুলে গেল বললে ভুল হবে, লোভে পড়েই মূলত সে ভুলে যেতে বাধ্য হলো।

দৈত্য বলল, মালিক– আজ আপনার সঙ্গে আমার হিসাব-নিকাশ মেলানোর দিন। আপনার নিশ্চয়ই আমার শর্তগুলোর কথা মনে আছে। কিন্তু তার আগে আপনি আমার পাওনা ২০ লাখ টাকা ফিরিয়ে দিন। লোভে পড়া আলাদিন টাকা দেয়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলল, 'কই(!) আমি তো আপনার কাছ থেকে কোনো টাকা ধার নেইনি। আর আপনি কেনই বা এতগুলো টাকা আমাকে সেধে সেধে দিতে যাবেন।' মুহূর্তের মধ্যে সব হিসাব-নিকাশ ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আলাদিন তার দেয়া কথা রাখতে পারল না। দৈত্য এবার আলাদিনকে বলতে লাগল, 'মালিক আমি জানতাম আপনি আপনার শর্তকৃত ওয়াদাগুলো রক্ষা করতে পারবেন না।' আপনার আগে যে ব্যক্তিটি আমাকে এতদিন আটকিয়ে রেখেছিল সেও তার শর্তকৃত এসব ওয়াদা পূরণ করতে পারেনি। যার দরুণ এতদিন সে আমাকে চেরাগে ভরে রেখেছিল। তাই যেহেতু আপনি আপনার শর্তগুলো রক্ষা করতে পারেননি সুতরাং আপনার ইচ্ছাগুলোও আমি পূর্ণ করতে অক্ষম। কিন্তু আমি জানি আপনি আমার টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে চাইবেন না। তাই টাকাগুলো আমি ফিরিয়ে নেব আমার শক্তির বলে। মুহূর্তের মধ্যে দৈত্যটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং পকেটে থাকা আলাদিনের টাকাগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল। দৈত্যটি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলাদিনের অপ্রাপ্তির খাতায় আরেকটি অধ্যায় যোগ হলো। যোগ-বিয়োগের হিসাব কষছে এখন আলাদিন।

# পুরনো Fantasy-এর নতুন রূপ

ছোটবেলা থেকেই আমরা প্রত্যেকে কত রঙবেরঙের ফ্যান্টাসি গল্প শুনে আসছি একই রূপে ও একই ফর্মে। মাঝে মাঝে একঘেয়েমি দূর করতে প্রয়োজন গল্পের ফর্ম পাল্টানোর; ঠিক সে রকমই একটা প্রয়াস নিয়ে এবারের কার্টুন ...

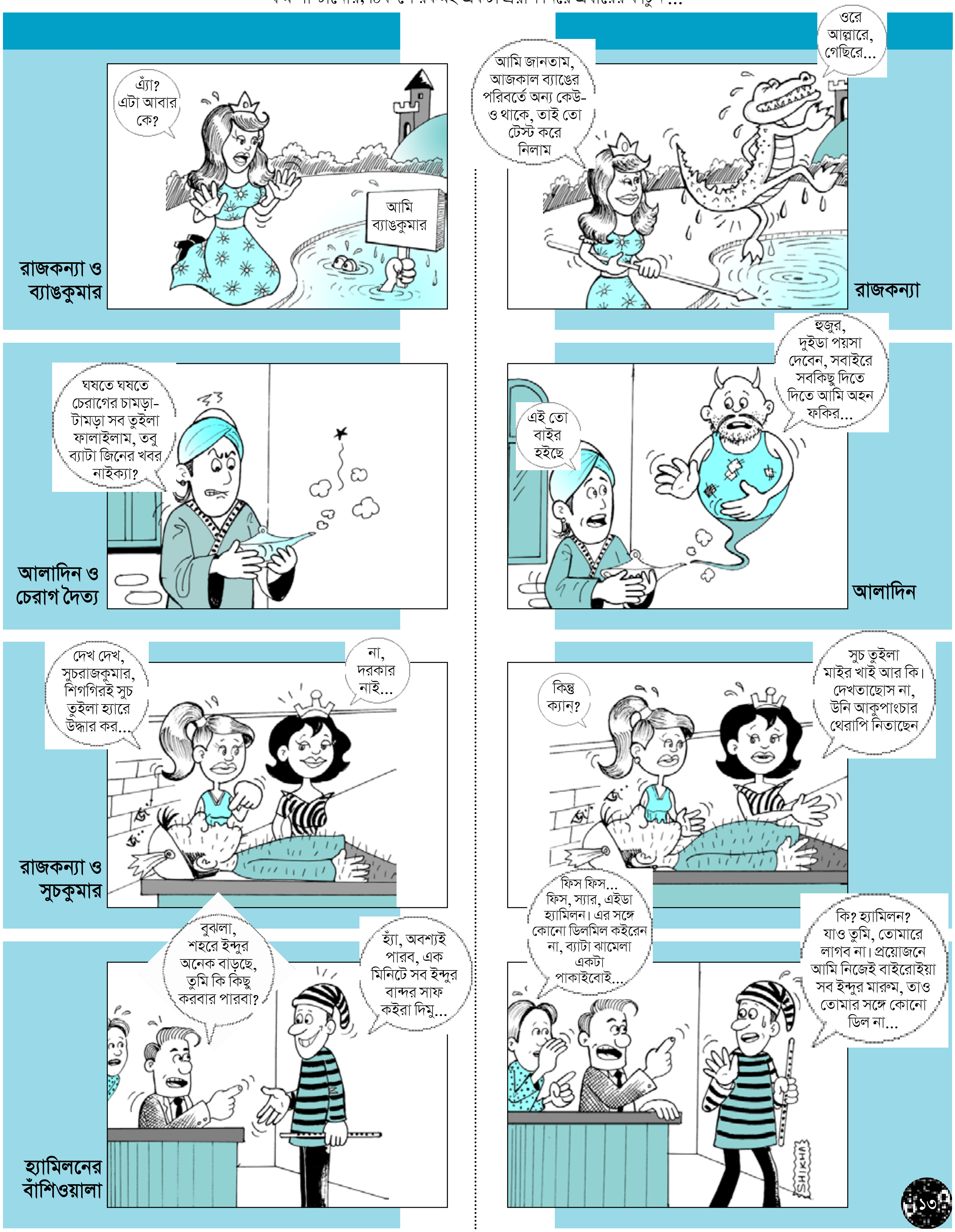

# নো নেমস ল্যান্ড

হিটলার এ. হালিম

মমিন আমার পাশে চেয়ার টেনে বসল। এমনভাবে চেয়ারটা টানল যাতে কোনো শব্দ না হয়। মমিন চুপচাপ বসে আছে। কোনো কথা বলছে না, বলবেও না। ও এরকমই, বিরক্ত করে না। সব সময় মিইয়ে থাকে। ওর তাকানো দেখলে মনে হয়, সে আমার কাজ দেখছে, দেখে আনন্দ পাচ্ছে।

ওকে দেখলেই আমার বিরক্ত লাগা শুরু হয়। কেন, ও এসে বসে থাকবে কেন? আমার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করে। হাত-পা নিশপিশ করে। ঘনঘন পানি পিপাসা হয়। এটা মমিন বোঝে না। ও বসে থেকে আমার লেখা দেখে, কাজ দেখে। মনে হয় ও আমার এসব দেখেই মুগ্ধ। কথা না বললে কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক ৩০ মিনিট পরে মিনমিন করে বলবে, 'দোস্ত আমি যাই' বলেই হনহন করে দরজা পর্যন্ত যাবে। একবারও পেছন ফিরে দেখবে না। দরজার কাছে গিয়ে জুলুজুলু চোখে আমার দিকে তাকাবে। ওর ওই তাকানোর দৃশ্যটা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এ রকম, 'দোস্ত, একবার বল, থেকে যাই।' আমি বলি না। মমিন চলে যায়। ও চলে গেলে আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়। কেন, ও এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন। কি এমন ব্যস্ততা। আর দুটো মিনিট বসলে কি ক্ষতিটা হতো। আমি মেজাজ খারাপ করে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াই। স্টলে চায়ের অর্ডার দেই। হঠাৎ পাশ থেকে মমিন এসে বলে, 'আমার জন্য চায়ের অর্ডার দিতে হবে না, তুই খা আমি দেখি।' আমি ওর জন্য চায়ের অর্ডার দেই। চায়ের কাপ হাতে মমিন দাঁড়িয়ে থাকে। মমিন খুশিতে আটখানা হয়ে বলে, 'এই এক কাপ চার জন্য তোর কাছে আসি।' চা শেষ হলে কাপটা নামিয়ে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে ও চলে যায়।

এক বিকেলে মমিনের মোবাইলে ফোন দিলাম। 'কিরে কি করিস?' ও প্রান্ত থেকে মমিনের জবাব, 'বসে আছি।' 'কোথায়?' 'বাসের মধ্যে, পেছনের সিটে।' 'বাসটা কোথায়? 'রাস্তায়!' আমার তো মেজাজ খিঁচে ওঠে। 'ব্যাটা রসিকতা করিস?' 'বাসতো আকাশে থাকবে না, থাকবে রাস্তায়।' 'খচ্চর কোথাকার। তা রাস্তায় যে বললি, সেটা কোথায়?' মমিন মিনমিন করে উত্তর দিল, ' রাস্তা রাস্তায়, বাসটা রাস্তার মাঝখানে। রোড ডিভাইডারের কাছে।' আমার তো ততক্ষণে মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, তুই যে বাসটায় আসছিস সে বাসটা এখন কোন এলাকায়?' মমিন এবার আরো শীতল গলায় জবাব দিল, 'দোস্ত এ এলাকার নামটাতো জানি না।' 'বাপ তুই দয়া করে ওই এলাকার একটা বর্ণনা আমাকে দে। তোকে আমার খুবই দরকার।' 'দরকার যখন অপেক্ষা কর। আমি আসছি। মমিনের এ কথা শুনে আমি রাগতে গিয়ে রাগতে পারলাম না। ফের বলি, 'তোর বাস কোন এলাকায় আছে আমাকে নামটা বল।' ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। মোবাইলের টাকা কাটা যাচ্ছে। মমিনের একই জবাব, 'জায়গাটার নাম জানি না, বাস থেমে আছে। চলন্ত অবস্থায় থাকলে এতক্ষণে কোনো নামঅলা জায়গায় থাকতাম। এলাকার একটা বর্ণনা দিই শোন। আমার ডানদিকের যে মোড় ওই মোড়টা থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে কাকরাইল আর বেইলি রোডের দিকে। পেছনে কাকরাইল মসজিদ। সামনে শেরাটনের পাশের রাস্তার প্রবেশ মুখ। এ জায়গার কোনো নাম জানি না। তুই একটু খোঁজ নেতো এ জায়গাটার নাম কী? নামবিহীন জায়গায় আছি ভাবতে খারাপ লাগছে। নো ম্যানস ল্যান্ডের কথা শুনেছি, নো নেমস ল্যান্ডের কথা শুনিনি। জায়গার নামটা জেনে আমাকে জানা।' বুঝলাম মমিন কোথায় আছে। 'আমি ফার্মগেটে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে আছি, তুই আয়। মমিন নিরাসক্ত গলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করবি, বাদাম খা।' 'নিকুচি করি তোর বাদাম খাওয়ার।' মোবাইলের লাইন কেটে দিলাম। আধঘণ্টা পরে মমিন বাস থেকে নামল। নামতে গিয়েই পড়ল একটা চলন্ত বাসের সামনে। কোনো মতে নিজেকে সামলে সরে এল এক পাশে। ওদিকে ড্রাইভার মমিনকে 'এই কানা শুয়োর' বলে গালি দিল। মমিনও খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি না, তোর বাপ।'

আমি ওর স্মার্ট জবাবে খানিকটা অবাক হলাম। এই আমাদের মমিন আলী ওরফে কদম। মমিনের সারামুখ জুড়ে একটা দুষ্টু হাসি। কী দরকারে যে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তার সে কোনো ধারও ধারল না। একবার শুধু বলল 'ও তুই'!

মমিন ডুব মেরেছে। ও এ রকম প্রায়ই করে। কোনো খোঁজ থাকে না। অফিসে পৌঁছে খোঁজ নিতেই জানলাম তিন দিনের ছুটি নিয়েছে মুমিন। কোথায় গেল। ও একদিন আমার অফিসে না এলে আমার খারাপ লাগে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ও যে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসত, সেটা খালি থাকে। বারবার ওদিকে চোখ যায়। অফিসের কাজ সেরে রাত ৯টায় পৌঁছলাম মমিনের মেসে। মেস বলতে পাঁচ তলার ছাদের একটা কামরায় ও এক বন্ধুর সঙ্গে থাকে। পুরো ছাদটা মমিনরা ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ নেই। জোছনা রাতে মমিন ছাদে বসে আছে। দূর থেকে দেখলাম মমিন কী যেন করছে। কাছে যেতেই দেখি ওর হাতে একটা পানি ভর্তি গ্লাস আর একটা বড় বোল। গ্লাসের ভেতর চাঁদ নিয়ে ও খেলছে। খানিকক্ষণ এভাবে দেখে শেষমেশ প্রশ্ন করেই ফেললাম। মমিন আমার দিকে না ফিরে যে উত্তর দিল তা শুনে আমিও চাঁদের দিকে তাকালাম। মমিন বলে যাচ্ছে, 'বুঝলি একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি। ওর নাম শশী। এ নামের অর্থ তো জানিস, চাঁদ। কিন্তু কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছি না। অথচ দেখ দেখ কত সহজে আমি চাঁদকে গ্লাসের মধ্যে আনতে পারছি। বোলের মধ্যে ধরতে পারছি। কিন্তু বাস্তবে কিছুতেই ধরতে পারছি না।' তাকিয়ে দেখলাম বোলের পানির ভেতর চাঁদ দেখা যায়। মমিন বোলের পানিটা একটু নাড়িয়ে দিতেই চাঁদটা পানির ভেতর একটু একটু করে কাঁপতে থাকে। মমিন উদাস গলায় বলল, অথচ আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর হৃদয়টা কাঁপাতে পারছি না।' মমিন গান ধরল, 'আমি যামিনী/তুমি শশী হে/ভাসিছ গগনও মাঝে।'

দিন দুয়েক পরের কথা। মমিনের সঙ্গে দেখা। চাঁদ বগলদাবা করে হাঁটছে। হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা! মমিন পরিচয় করিয়ে দিল মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটির হাবভাব দেখে আমার কেমন যেন ঠেকল। সপ্তাহ দুয়েক পর মমিন এসে আমার পাশের চেয়ারটায় বসল। আগের মতো। হঠাৎ মমিন বলে উঠল, দোস্ত, । চল, তোদের ছাদে যাই চাঁদ দেখতে। ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে আছি। ভাবলাম মমিন তো চাঁদ ধরেই ফেলেছে। তাই এবার গ্লাস বা বোল নয়, সরাসরিই দেখছে। চাঁদ দেখতে পেলাম। মমিনও দেখছে, তবে কোনো উৎসাহ নেই ওর ভেতর। উদাস গলায় বলল, দেখেছিস ঈদের চাঁদটা কেমন বাঁকা। আসলে শশী বোধ হয় এমনই। কেবলই বেঁকে যায়। চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। কী বলে ও! মমিন বলে যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কের ১২ দিনের মাথায় শশী ১৫ হাজার টাকা ধার চাইল। টাকাটা দেয়ার পর থেকে শশীর কোনো খোঁজ নেই, মোবাইল বন্ধ। আজকে কুরিয়ারে একটা চিঠি পেলাম, সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে দুঃখিত হয়ে চিঠি লিখেছে!'

মমিন তার ছোটবেলার চাঁদ দেখা বিষয়ক একটা ঘটনা বলল। সে বলতে লাগল, 'শুনলাম ঈদের চাঁদ উঠেছে। বাড়িতে গাছপালা থাকায় পশ্চিম আকাশে চাঁদ দেখা যেত না। যেতে হবে নদীর পাড়ে। দৌড়ে গেলে সময় লাগবে অনেক। তাই সাইকেল নিয়ে বের হলাম। তাড়াহুড়ো করে চালাতে গিয়ে সাইকেলের নিচে চাপা পড়ে প্রতিবেশীদের একটা হাঁস মারা গেল। হইচই করে তেড়ে এল ওরা। চাঁদ দেখা শিকেয় উঠল। ওদের সঙ্গে এমনিতেই আমাদের পুরনো শত্রুতা। এবার তো ওরা ঝেড়ে কাশবে। পকেটে টাকা ছিল। হাঁসের দাম দিতে চাইলাম, ৭০ টাকা। হনুমানমুখো বাড়িঅলা বলল, 'হাঁসের দাম ৭০ টাকা ঠিক আছে। তাই বলে ৭০ টাকা দিলে তো হবে না। এ হাঁস বেঁচে থাকলে কমপক্ষে ২০০ ডিম দিত। ওই ডিমের দাম ৬০০ টাকা। ২০০ ডিম থেকে বাচ্চা হলে প্রতিটার দাম হতো ৭০ টাকা। তাহলে ২০০ হাঁসের দাম ১৪ হাজার টাকা। ওই হাঁসগুলো প্রতিটা ২০০ করে ডিম দিলে...এ পর্যন্ত যেতেই থামিয়ে দিয়ে লোকটিকে বললাম 'থাক, অনেক বলেছেন।' হনুমানমুখো লোকটি বলল ঠিক আছে। এ পর্যন্তই থাক। তাহলে হিসাব কষে দাম হলো ১৪ হাজর ৬৭০ টাকা। এ টাকা না দিলে তোমাকে ছাড়ছি না।' 'ওরা আমাকে বেঁধে রাখল। এ নিয়ে অনেক হৈ হাঙ্গামা হলো, সালিস বিচার বসল। ঈদের দিন ১০ হাজার টাকা দিয়ে দফারফা হলো। বাড়ি এলাম, বন্দিদশা থেকে। বাড়ি এসে কী কী হলো তা শুনিস না। লজ্জায় সেই যে বাড়ি ছাড়লাম।' দোস্ত, এ দেশে গাড়ি বা সাইকেল চাপা পড়ে হাঁস মরলে মানুষ টাকা চায়। গাড়ি চাপা পড়ে মানুষ মরলে চায় না! ■